BHARTIA SAHITYA

MA [Bengali]

Fourth Semester

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Biswanath Roy

Retd. Professor, Bengali Language & Literature, University of Calcutta

Author

Dr. Manan Kumar Mandal, Associate Professor in Bengali, Netaji Subhas Open University

Copyright © Reserved, 2018

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

VIKAS®

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বইম্যাপিং
প্রথম একক :	**একক -১**
চিংড়ি :: তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই	পৃষ্ঠা (1 - 26)
দ্বিতীয় একক :	**একক - ২**
বিপ্লব চক্রবর্তী (সম্পাদিত) :: আধুনিকি ভারতীয় কবিতা	পৃষ্ঠা (27 - 59)
তৃতীয় একক :	**একক - ৩**
আধে আধুরে :: মোহন রাকেশ	পৃষ্ঠা (61 - 84)
চতুর্থ একক :	**একক - ৪**
ইন্দিরা গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ গল্প নির্বাচিত (অনুবাদ - মুক্তি চৌধুরী)	পৃষ্ঠা (85 - 125)

সূচীপত্র

প্রথম একক : **পৃষ্ঠা (1 - 26)**

চিংড়ি :: তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই

দ্বিতীয় একক : **পৃষ্ঠা (27 - 59)**

বিপ্লব চক্রবর্তী (সম্পাদিত) :: আধুনিকি ভারতীয় কবিতা

১ -২০ সংখ্যক : আসাদ উল্লাহ খান গালিব (উর্দু)

সব নেভা দ্বীপ জ্বালিয়ে নেব : মহাদেবী বর্মা (হিন্দী)

হে অরণ্য হে মহানগর : নবকান্ত বরুয়া (অসমিয়া)

ওয়ারিস শাহকে বলছি : অমৃতা প্রীতম (পঞ্জাবী)

তৃতীয় একক : **পৃষ্ঠা (61 - 84)**

আধে আধুরে :: মোহন রাকেশ

চতুর্থ একক : **পৃষ্ঠা (85 - 125)**

ইন্দিরা গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ গল্প নির্বাচিত (অনুবাদ - মুক্তি চৌধুরী)

(যাত্রা, পরশুপাতরের কুয়ো, , উলঙ্গশহর, বরফের রাণী, সংস্কার, শূণ্যবাক্স)

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মুখবন্ধ / ভূমিকা

বিভিন্ন ভাষাভাষীর এই দেশ ভারতবর্ষ। বাংলা, উর্দু, হিন্দি, অসমিয়া, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষা যেমন আছে তাদের আলাদা আলাদা সাহিত্য ও আছে। এই বিভিন্ন ভাষাভাষীর সাহিত্য নিয়ে আমাদের এই ভারতীয় সাহিত্যের বইটি রচনা করা হয়েছে যার মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা চারটি এককে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সাহিত্যের মাধুর্যতা উপলব্ধি করবে।

প্রথম এককে ছাত্রছাত্রীরা তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই এর লেখা চিংড়ি গল্পটি, দ্বিতীয় এককে বিপ্লব চক্রবর্তী সম্পাদিত বিভিন্ন ভাষাভাষীতে লেখা বিভিন্ন লেখকের কবিতা। তৃতীয় এককে মোহন রাকেশের লেখা আধে আধুরে এবং চতুর্থ এককে ইন্দিরা গোস্বামীর কিছু শ্রেষ্ঠ গল্প এই ভারতীয় সাহিত্য বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রথম একক :চেম্মিন : তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই

শিবশঙ্কর পিল্লাই এর জীবন :

টিপ্পনী

শিবশঙ্কর পিল্লাই জন্মগ্রহণ করেন কেরলের আলেপ্পি শহর থেকে দশ মাইল দূরবর্তী একটি পল্লীগ্রাম তাকাষিতে ১৮১৪ সালের এপ্রিল মাসে। জন্ম হয়েছিল যে গ্রামে সেই গ্রামের নামেই শিবশঙ্কর পিল্লাইকে অন্যান্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যিক ও শিল্পীর মত 'তাকাষি' নামে পরিচিত পান। শিবশঙ্কর পিল্লাই এর পিতা ছিলেন একজন সম্পন্ন জোতদার, সজ্জন ব্যাক্তি। কেরলের নৃত্যনাট্য কথাকলি'র একজন রসবেত্তা ছিলেন তিনি। কথাকলির চিরস্মরণীয় ব্যাক্তিত্ব কুঞ্জকুরূপ ছিলেন শিবশঙ্কর পিতৃব্য। শিল্প সাহিত্যের চর্চা ছিল এই পরিবারে পুরুষানুক্রমিক। বালক তাকাষির বড় হয়ে ওঠায় এই পারিবারিক শিল্পিত জীবনচর্যার একটা ভূমিকা ছিল। সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রামায়ণ ও মহাভারত থেকে পাঠ করে শোনানোর রেওয়াজ ছিল বাড়িতে ; এসব থেকে বালক তাকাষি সঞ্চয় করেছিলেন বৃহত্তর জীবনবোধের ভূমিকা, ক্লাসিকের চিরায়ত জীবন। গ্রামের পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হলে শিবশঙ্কর ভর্তি হয় আম্বালাপুষার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য আম্বালাপুষার বিদ্যালয়টি ছিল জেলেপাড়ার মাঝখানে এবং সমুদ্র তীরবর্তী। সেজন্য জেলে ও ধীবরদের ব্যাক্তিজীবন এবং সামাজিক জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। সে অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাতেও এসেছে পরবর্তীকালে। এই আম্বালাপুষাতেই তাকাষি শুরু করেছিলেন তাঁর প্রথম কর্মজীবন, একজন আইনজীবি হিসেবে।

স্কুলে পাঠ শেষ হলে তাকাষি চলে যান ত্রিবান্দ্রামের আইন কলেজে ; তখন ত্রিবান্দ্রামের দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী। গতিময় নাগরিক জনজীবন, বাণিজ্যক্ষেত্র, ত্রিবান্দ্রামের জীবন গ্রামের কিশোরকে কাছে তেনে নিয়েছিল এমনটা বলা যায় না। কিন্তু এই নাগরিক ব্যস্ত পরিসরের মধ্যেই গরিব, দুস্থ, মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ তাকে পেয়ে বসেছিল। নাগরিক বৌদ্ধিক বৃত্তে অন্তর্গত হয়ে গেলেন যুবক তাকাষি। চলতে লাগল তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, জ্ঞাণান্বেষণের সাধনা। প্রচুর পড়াশুনোর পাশাপাশি তাঁর আগ্রহ গড়ে উঠল বামপন্থী রাজনীতিতে। পাশ্চাত্যসাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা, মার্কস থেকে ফ্রয়েড সমস্ত কিছুই ক্রমে তাকে লেখক হবার দিকে এগিয়ে দিল। এসময়ে তিনি

টিপ্পনী

কিছু ছোটগল্প লিখেছিলেন ; মালায়লম কথাসাহিত্যে অল্পবিস্তর পরিচিতিও ঘটতে থাকে তাঁর। এই সময় থেকেই লেখক হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'থোড্ডিয়ুডে মাকান' (ধাঙড়ের ছেলে) প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। আলেপ্পি জেলার এক নিম্নবর্গীয় হরিজন সমাজের মধ্যে কীভাবে সামাজিক অধিকার ও মানবিক অধিকারের দাবী ওঠে তা এই উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে একজন সচেতন ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা এবং অন্যদিকে একজন বয়স্ক হরিজন ধাঙড়ের মন ও মানসিকতার পরিবর্তন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'রন্টিতাঙ্গাষি' (দু'কুনকে ধান)। সমকালীন মালয়লম সাহিত্যে এই উপন্যাসটি খুব সাড়া ফেলেছিল। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হ'ল প্রান্তিক ঠিকে কৃষি-শ্রমিকদের জীবন-সংগ্রাম। কীভাবে জমির সঙ্গে তাদের মনের আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তা কতটা গভীরভাবে তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। সাহিত্যে অকাদেমির উদ্যোগে উপন্যাসটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এগুলির আগে প্রকাশিত হয়েছিল 'পরমার্থমঙ্গল' (বাস্তব, ১৯৪০) এবং 'পন্ডিতপঙ্কজম' (ছিন্নশতদল, ১৯৪৪)। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলির কয়েকটি হ'ল : 'ঔসেপ্পাইন মাক্কাল' (ঔসফের সন্তান ১৯৫৯), 'এনিপ্পাডিকাল' (মই, ১৯৬৪), চুকু (শুকনো আদা, ১৯৬৭), এবং বিখ্যাত 'কয়্যার' (দড়ি, ১৯৭৮)। শেষোক্ত উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট সুবিশাল। কেরলের দেড়শ বছরের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে উপন্যাসটিতে। সব মিলিয়ে তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় সাঁইত্রিশ ; গল্পগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় কুড়িটি। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হল ; 'টেরাঞ্জেদুট্টে কথাকাল' (নির্বাচিত গল্প, ১৯৬৫), 'ইনকিলাব' (১৯৫২), 'পতিব্রতা' (১৯৪৬), 'নাঞ্জান পিরান্না নাডু' (যে মাটিতে আমি জন্মেছিলাম, ১৯৫৮), 'কুরু কথাপত্রঙ্গেল' (অনেকগুলি চরিত্র, ১৯৮০), 'এ ব্লাইন্ড ম্যান'স কন্‌টেনমেন্ট' (১৯৭৬) ইত্যাদি। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষাভঙ্গি, নিম্নবর্গীয় জনজীবনের অপূর্ব উপস্থাপন তাঁর কথাসাহিত্যকে অনন্য করে রেখেছে। সাধারণ মানুষের মনগহনের মধ্যে আলো ফেলে তিনি ভারতীয় কথা সাহিত্যের অঙ্গনকেই বিপুল বিস্তৃতি দিতে সক্ষম হয়েছেন।

তাকাষি ১৯৫৭ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। পরবর্তিতে কেরল সাহিত্য অকাদেমি সম্মান (১৯৬৫), 'সোভিয়েত দেশ' পুরস্কার (১৯৭৪), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৮৪) পেয়েছিলেন। ভারতীয় সরকার ১৯৮৫ সালে তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাইকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৯৯ সালের ১০ই এপ্রিল ছিয়াশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মালায়ম উপন্যাস : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের মত মালায়লম ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে। প্রথম মৌলিক মালায়ালাম উপন্যাস রচনা করেছিলেন অপ্পু নেডুঙ্গাডি ১৮৮৭ সালে ; উপন্যাসটির নাম 'কুন্দলতা'। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' এর রচনাকালও একই বছর। নেডুঙ্গাডির ঔপন্যাসিক কাহিনি নির্মাণে অনেক ত্রুটি-দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এটুকু বলা যায় যে তিনি গল্পের মধ্যে একটি রহস্য ও আগ্রহ তিনি বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতই তাঁর ক্ষেত্রেও ইংরাজি ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কট্ - এর ঔপন্যাসিক বয়ান সাহায্য করেছিল। এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল জীবনের বাস্তবতার যথার্থ প্রতিফলনের অনুপস্থিতি। ১৮৮৯ খিষ্টাব্দে ও চান্দু মেনন রচনা করেন ইন্দুলেখা'। এটি প্রথম সার্থক মালায়ালম উপন্যাস। উপন্যাসটি সে অর্থে সত্যিই আধুনিক উপন্যাসের রীতি প্রকরণ মেনে রচিত। চান্দু মেননের কথা থেকেই জানা যায়, লর্ড বেকনফিল্ডের 'হেনরিয়েটো টেম্পল' পড়ে তিনি এই উপন্যাস রচনায় উদ্বদ্ধ হয়েছিলেন। লেখক এখানে খুব সুন্দরভাবে সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। উচ্চবর্গের সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে, সামাজিক কুসংস্কার ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের মানুষ ও নব্য-শিক্ষিত প্রজন্মের সংঘাত এ উপন্যাসের মূল বিষয়। পুরাতন শক্তির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের প্রগতিবোধ ও অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধতা নিয়ে শাশ্বত মূল্যবোধ এখানে জয়ী হয়েছে। মাধবন ও ইন্দুলেখা এই আলোকপ্রাপ্ত প্রতিনিধি; অন্যদিকে পঞ্চু মেনন ও সুরি নাম্বুতিরি হলেন চিরাচরিত রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষিতে চান্দু মেননের এই উপন্যাস যে সামাজিক বাস্তবতার পটচিত্রকে হাজির করে তা অভিনব। সমাজ সংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় 'ইন্দুলেখা' উপন্যাসটি সামাজিক কুপ্রথা ও অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে যেভাবে লিখিত হয়েছিল তা সত্যিই প্রশংসনীয়। চান্দু মেনন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'শারদা' রচনা সমাপ্ত করার আগেই মারা যান। পেশায় তিনি ছিলেন বিচারপতি। বহু মানুষের চরিত্রকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। মামলা মোকদ্দমার বিষয় নিয়েই উপন্যাসটি রচিত। শারদা উপন্যাসের নায়িকা। এই অসম্পূর্ণ উপন্যাস থেকেই উপলব্ধি করা যায় চান্দু মেননের সাহিত্যিক কৃতিত্ব।

সি ভি রামন পিল্লেই মালায়ালম উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক। মালায়লম উপন্যাসের সূচনাপর্বে রোমান্সের কল্পনা উৎসারণকে অবিস্মরণীয় করে গেছেন রামন পিল্লাই। তাঁর উপন্যাস মূলত ঐতিহাসিক ; এজন্য তিনি ওয়াল্টার স্কটের

টিপ্পনী

প্রত্যক্ষ অনুসরণকারী। চান্দু মেননের উপন্যাসে যে সামাজিক বাস্তবতার প্রকাশ অনন্য হয়ে উঠেছিল, রামন পিল্লাই সেপথে হাঁটেন নি। তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনেছেন ঔপন্যাসিক কাহিনির দুরন্ত বিস্তার, মহাকাব্যিক বিশালতা। রোমান্সধর্মীতার নিরিখে তিনি চিরকাল মালায়ালম উপন্যাসে স্মরনীয় থাকবেন। ১৮৯১ সালে তাঁর রচিত 'মাতন্ড বর্মা' মালয়ালম উপন্যাসে এমনই যুগান্তর সূচিত করেছিল। ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণে একটি রাজ্য ' ধেনাড় ', তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজা মার্তন্ড বর্মার কাহিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু। মার্তন্ড বর্মার দুই মামাতো ভাই তাম্পিদের সিংহাসনের গদিলাভ করার জন্য যে অন্তকর্লহ তার সঙ্গে জুড়েছে এক সক্ষম পুরুষ অনন্ত পদ্মনাভনের চরিত্র। 'ইন্দুলেখা' ও মার্তন্ড বর্মা' উপন্যাস দুটির প্রত্যক্ষ প্রভাবে অনেক উপন্যাস রচনার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু কোনোটাই সেই উচ্চতায় উন্নীত হতে পারে নি। রামন পিল্লাই এর পরবর্তী উপন্যাস 'ধর্মরাজা'; এটি প্রায় বিশ বছর পর লেখা। এই উপন্যাসটিও ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা কার্তিকা তিরুনাল, যিনি ধর্মরাজা নামে পরিচিত ছিলেন তাঁকে নিয়ে রচিত। ধর্মরাজা ও তাম্পিদের মৃত্যুর পর তাদের সমর্থক যে আটজন সর্দার, যারা এটুভিতিল পিপ্পামার 'আটবাড়ির পিল্লারা' বলে পরিচিত, তাদের উত্তরাধিকারীদের সংঘর্ষ - এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি 'মার্তন্ড বর্মা' উপন্যাসের থেকেও ভাল ফুটেছে। ভাষা অলঙ্কারময়, সংস্কৃত শব্দ রচনার চলনকে দুরূহ করে তুলেছে অনেক জায়গায়। এরপর সি ভি রামন পিল্লাই রচনা করেছিলেন মালায়ালম উপন্যাসের এক অন্যতম উজ্জ্বল সাহিত্যকৃতি 'রামরাজা বাহাদুর' উপন্যাস। 'ধর্মরাজা' উপন্যাসের কাহিনি যেখানে শেষ হয়েছে, ত্রিবাঙ্কুল রাজবংশের সেই পর্যায় থেকেই এই উপন্যাসের সূত্রপাত। এখানে প্লটের টানটান উত্তেজনা ও রহস্য শেষপর্যন্ত বজায় থেকেছে। চরিত্রগুলি যেমন সফলভাবে পরিস্ফুট তেমন রোমান্টিকতার বিস্তার। মালয়লম উপন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়ে 'রামরাজা বাহাদুর' সর্বপেক্ষা সুলিখিত ও সুগঠিত উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি।

টিপ্পনী

সি ভি রামন পিল্লাই এর সূত্র ধরে মালায়লম ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অনেক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য হল, আপ্পন তাম্পুরান রচিত 'ভুতরায়র' (পেরুমালদের কেরালা এই উপন্যাসের পটভূমি), অম্বাডি নারায়ণ পোদুবাল রচিত 'কেরালা পুত্র', তি রামন নাম্বিসানের 'কেরলেশ্বরণ', কন্নাপ্পা কৃষ্ণমেননের 'চেরমান পেরুমাল' ইত্যাদি। এসবগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে 'ভূতরায়র, শ্রেষ্ঠ ও সুখপাঠ্য। পরবর্তীতে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সর্দার কে এন পাণিক্কর। তিনি মোট পাঁচটি ঐতিহাসিক রোমান্স রচনা করেছিলেন; সেগুলি হ'ল : 'পূর্ণকোটু স্বরূপম্', 'পারাঙ্কি পদয়ালি',

‘ধূমকেতুবিন্টে উদয়ম’, ‘কেরালা সিংহম’ এবং ‘কল্যাণমল’।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার একটি ধারা যদি উপরোক্ত উপন্যাসগুলি নির্দেশ করে তাহলে রাজনৈতিক ও সামাজিক উপন্যাসের পরিচয়টিও নেওয়া দরকার। ‘ইন্দুলেখা’, ‘শারদা’র পর নতুন করে সমাজ - রাজনীতির প্রেক্ষাপটটি ব্যবহৃত হয়েছিল ‘উদয়ভানু’ (রামকৃষ্ণ পিল্লাই) ও ‘পারাপ্পুরম’ (কে নারায়ন কুরুক্কল) উপন্যাস দুটিতে। দুজনেই বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন। তাঁদের সম্পাদিত পত্রিকাতেই উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয়েছিল। সি ভি রামন পিল্লাই এর ‘প্রেম অমৃতম’ উপন্যাসটিতেও সমকালীন ত্রিবান্দ্রাম শহরের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যাবে। কন্নন মেননের ‘স্নেহলতা’, তি কে ব্রেলু পিল্লাইয়ের ‘হেমলতা’, এন কে কৃষ্ণ পিল্লাই এর ‘কাম্বোলা বালিকা’ ইত্যাদিতে সামাজিক পরিচিতির ছোঁয়া রয়েছে। কে এম পানিক্করের ‘দোরাপ্পিনি’ একটি বিদ্রুপাত্মক সামাজিক উপন্যাস। এছাড়া রয়েছেন ভবত্রাতন নাম্বুডিরিপাড এর মত লেখক যাঁরা সচেতন লেখনিতে নিজেদের রচনায় সামাজিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছিলেন।

চান্দু মেনন ও রামন পিল্লাই এদের পরবর্তীতে মালায়লম উপন্যাসে বড়সড় বাঁকবদল এসেছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবের ফলে। পন্ডিত এ বালকৃষ্ণ পিল্লাই ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী। নতুন প্রজন্মের লেখকদের প্রেরণাস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। পুরাতন আদর্শের শূণ্যগর্ভতা ও নতুন আদর্শের প্রতি আকর্ষণ তিনি নবপ্রজন্মের মধ্যে চারিয়ে দিয়েছিলেন। কেশবদেব ও তাকাষি পিল্লাই এর মধ্যে এই পরিবর্তন প্রথম লক্ষ করা যায়।

মালয়লম উপন্যাসে তাকাষির স্থান :

মালয়লম উপন্যাসের আধুনিকতার সঙ্গে তাকাষির নাম জড়িয়ে আছে। ‘পতিত পঙ্কজম’ ও ‘প্রতিফলম’ তাঁর প্রথম দুখানি উপন্যাস। সামাজিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এই গ্রন্থদুটিতে রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। সামাজিক রক্ষণশীলতাকে আঘাত করার পর তাকাষি শ্রেণিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষের যে অবস্থান তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন ‘তালায়েড়ু’ (কঙ্কাল) ও ‘তোড্ডিযুডে মক্ন’ (মেথরের ছেলে) ও তেন্ডিবর্গম (ভিক্ষুক শ্রেণি) উপন্যাসের মধ্যে। তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস ‘রন্টিতাঙ্গাষি ডাঙ্গাডিনে’ (দু’কুনকে ধান) তে তিনি অস্পৃশ্য পারায়া মজুরদের কথা চিত্রিত করেছেন। অন্যদিক আমাদের পাঠ্য উপন্যাস ‘চেম্মিনে’ সমুদ্রকূলবর্তী ধীবর সম্প্রদায়ে অন্ধবিশ্বাসী সংস্কারগ্রস্থ নিচুতলার মানুষের ছবি এঁকেছেন। মালয়লম উপন্যাসের আধুনিকতা তাঁকে বাদ দিয়ে হয় না। সাহিত্যের পাতায় যাদের অবস্থান ছিল অন্তেবাসী তাদের তিনি নিয়ে এসেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।

টিপ্পনী

সমুদ্র - নদী - জেলে জীবনকেন্দ্রিক অন্যান্য উপন্যাস :

সমুদ্র -নদী মানুষের সভ্যতার আদিকাল থেকে তার সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। সাহিত্যে এই সংলগ্নতার প্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটেছে। এর কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে বিশ্বের অন্যান্য ভাষার উপন্যাসে। ইংরাজি সাহিত্যে আমরা পাই আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্যা ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সী' দেনিস লাৎসিসের 'জেলের ছেল' (১৯৩৪) ইত্যাদি উপন্যাস ; যেগুলির মধ্যে ব্যাক্তির সঙ্গে বৃহত্তর সামুদ্রিক জীবনের সংযোগ অনবদ্য ভাবে ফুটে উঠেছে। অনেকগুলি উপন্যাসে মৎস্যশিকারের প্রসঙ্গে এসেছে - যেহেতু এটি মানুষের আদিমতম পেশার একটি। যেমন : স্টিফেন গুইয়েন এর 'ডাফর লক্ এ ফিসারমভানস্ন এডভেঞ্চার' (১৯২৪), নর্মান হিলের 'এ ফিসারম্যানস্ রিফ্লেকশনস্' (১৯৪৪), অলিভার কাইটরের 'এ ফিসারম্যান ডায়েরি' (১৯৬৯) ইত্যাদি।

টিপ্পনী

জেলে - ধীবর জীবন নিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে বেশ কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে। সে সব উপন্যাসের আবহ আঞ্চলিক হলেও তার মধ্যে রয়েছে এক আশ্চর্য অন্তর্গত সমান্তরতা। ভারতীয় সমাজজীবনের গভীর পরিচয় বহন করে উপন্যাসগুলি। নিম্নবর্গীয় জীবনচেতনার শিল্পিত উদাহরণ হিসেবে উপন্যাসগুলিকে দেখা যায়। রচয়িতাদের মধ্যেকার স্থানিক ও বিস্তর ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও সেগুলি ভারতীয় সমাজের এক আশ্চর্য অন্তর্লীন ঐক্যবোধকে সূচিত করে। মানিক বন্দোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' লিখেছিলেন ১৯৩৬ সালে ; পরবর্তিতে প্রকাশ পায় তাকাষি'র 'চেম্মিন' (১৯৫৬), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭), অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' ৯১৯৫৭), ভৈরবপ্রসাদ গুপ্তের 'গঙ্গা মাইয়া' (১৯৫৩), উদয়শঙ্কর ভট্টের 'সাগর লহ্‌রে আউর মনুষ্য' (১৯৫৫) ইত্যাদি। এই উপন্যাসগুলিতে উত্থাপিত সমাজচিত্রে ভারতীয় পরিবার - সমাজ - অর্থনীতি - রাজনীতির গভীর পরিচয় পাওয়া যায়।

চেম্মিন উপন্যাস :

মালয়লম ভাষায় রচিত 'চেম্মিন' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই কেরলের ধীবর - জেলে জীবনের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে নিম্নবর্গীয় জেলে জীবনের - সংগ্রাম ও ভাগ্যবিড়ম্বনার ট্রাজিক কাহিনি। এই মালয়লম উপন্যাসটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৫৭ সালে। মালয়লম সাহিত্যে বিপুল আলোড়ন উদ্দীপনার সূত্রপাত ঘটায় উপন্যাসটি। বহু ভারতীয় ভাষায় চেম্মিনের অনুবাদ হয়েছে। একটি বাংলা অনুবাদ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ; সেটি করেছেন বোম্মান্না বিশ্বনাথন ও নিলীনা আব্রাহাম। সাহিত্য অ্যাকাদেমি থেকে অনুবাদ প্রকাশ পায় ১৯৬৫ সালে।

উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনি :

প্রথম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় :

কেরলের সমুদ্রতীরবর্তী নিরকুন্নাথ একটি জেলেদের গ্রাম। সেখানে কারুতাম্মা তার বাবা - মা চেম্মনকুঞ্জ ও চাকীর সঙ্গে বাস করত। পঞ্চমী তার একমাত্র বোন। এই গরিব জেলেদের গ্রামে সকলের পেশা ছিল সমুদ্রে মাছ ধরা ও সেই মাছ বিক্রি করা। গরিব বলে সেই জেলে মাঝিদের সেই গ্রামে অধিকাংশেরই জাল ও নিজস্ব নৌকা কেনার সামর্থ্য ছিল না। পারীকুট্টি নামে মুসলমান যুবক ও নিরকুন্নাথের সমুদ্রসৈকতে বড় হয়ে উঠছিল। কারুতাম্মা ও পারীকুট্টির শৈশব কাটছিল এই সমুদ্রতীরবর্তী জেলে জীবনের নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে।

> "কারুতাম্মার বয়স তখন চার কি পাঁচ। সমুদ্রে ধারে ও ঝিনুক কুড়ত, কাক তাড়াত আর জাল ঝাড়ার সময় কুঁচো মাছ যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত তখন তাই কুড়ত। তার সঙ্গে তখন আর একজন ও মাছ কুড়ত তার শৈশবের খেলার সাথী, পারীকুট্টি। .... ওদের বাড়ির দক্ষিণদিকে পারীকুট্টির বাবা ঘর বেঁধেছিল। আজও সে বাড়ি সেখানে আছে। পারীকুট্টি আজ যুবক। বড়ো হয়ে সে মাছের ব্যবসা শুরু করেছে।"

একদিন উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সংরাগ জেগে উঠল। কারুতাম্মার নতুন যৌবন আলোড়ন তুলে দিল পারীকুট্টির শিরায় শিরায়। "আমার দিকে অমন করে তাকিও না, ছোটমিঞা" - বলে কারুতাম্মার হারিয়ে যাওয়া বাল্য পরিচয়কে নতুন খাতে বইয়ে দিল। সমুদ্রে ধারে 'ছোটমিঞা'র সঙ্গে দিদির লুকিয়ে দেখা করা পঞ্চমী তার মা চাকীকে জানিয়ে দিল; শুরু হ'ল টানাপোড়েন। মা মেয়েকে সাবধান করে দিয়ে বলে - "তুই আর খুকিটি নেই বুঝলি : তুই এখন ডাগর হয়েছিস। এখন তোকে সকলে খুকী না বলে জেলেনিই বলবে। এখন আর ছেলে মানুষের মত হাসাহাসি করার বয়স নেই বুঝলি ?" সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেদের নিরাপত্তা নয়ে লোকবিশ্বাসের গল্প শোনায়। জেলেনির সতীত্বের পবিত্রতাই মাঝসমুদ্রে সমস্ত বিপদের হাত থেকে জেলেপুরুষকে রক্ষা করে। এই হ'ল লোকবিশ্বাস : চাকী বলে -

> " দেখ খুকি এই মস্ত বড় সাগরটার বুকের ভেতর সব আছে। যা চাইবি সব। সমুদ্দুরে কত ঝক্কি মাথায় নিয়ে জেলেরা মাছ ধরতে যায় - সেখানে কত কি না হতে পারে কিন্তু দেখাবি তার সব ঠিক মতো ফিরে আসে। কেন জানিস ? সমুদ্দুরে তারা যখন যায় তখন তাদের বাঁচা মরা সব নির্ভর করে জেলেনিদের ওপর। জেলেনিরা যদি খাঁটি থাকে তাহলে তাদের মিনসেরা ঠিকই ঘরে ফিরে আসে, নিলে দেখতিস তাদের নৌকাগুলো সব ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে ডুবে

টিপ্পনী

যেত। কখনও কখনও আমাদের খারপ কাজে সমুদ্দুর শুকিয়ে যায়। সাগর দেবীর রাগ হলে তিনি সব ছারখার করে ফেলেন, ... কথাটা কি জানিস, খাঁটি থাকা, নিজেকে ঠিক রাখা। জেলের সম্পত্তি তার স্ত্রী খাঁটি থাকাটা"।

পারীকুট্টী মুসলমান, ফলতঃ তার চরিত্রে বিশ্বাস নেই; এমনটাই দাবী কারুতাম্মার মায়ের। একদিকে মায়ের সাবধানবাণী অন্যদিকে পারীকুট্টীর সমুদ্রসৈকত থেকে ভেসে আসা সঙ্গীত, দুয়ের দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হতে থাকে কারুতাম্মা। অন্যদিকে, এই লোকবিশ্বাসের অন্ধশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জীবন সংগ্রাম করে চলে চেম্মণকুঞ্জ। "অন্যের নৌকায় ভাগে কাজ করে চেম্মনকুঞ্জ। মাছ যা ওঠে তার ভাগ পায়। আগে সে দাঁড় বাইত এখন হাল ধরে। পরের নৌকায় খেটে সুখ নেই। চেম্মনকুঞ্জের তাই সবচেয়ে বড় সাধ যে নিজের একটা নৌকা আর জাল কেনে"। এক সম্পন্ন মাঝি হবার অপ্রতিরোধ্য বাসনা তার। নিজের নৌকা সে কিনবেই।

টিপ্পনী

এদিকে মেয়েকে পাত্রস্থ করার বয়েস হয়েছে। দিন-মজুর খাটা জেলে ভেলায়ুধনকে পাত্র হিসেবে পছন্দ হয় না চেম্মণকুঞ্জের। এদিকে ডাগর মেয়ের বয়েস হয়ে যাচ্ছে। সে ভাবে, নৌকা আর জাল কিনবে না মেয়ের বিয়ে দেবে। স্ত্রী চাকীর সঙ্গে পরামর্শ করে চেম্মনকুঞ্জ পারীকুট্টীর কাছ থেকে সাহয্য নিয়ে নৌকা - জাল কেনার পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনা পছন্দ হয় না কারুতাম্মার। রাতের অন্ধকারে দিনের পর দিন পারীকুট্টীর মাছের ঝুড়ি কারুতাম্মাদের বাড়িতে ঢুকতে থাকে। সুদখোর আউসেপ ও গোবিন্দের কাছ থেকে কিছুতেই চেম্মনকুঞ্জ টাকা ধার নেবে না। কারণ সে জানে সেই সুদ কোনোদিন শোধ হবে না, উলটে নৌকা-জাল তাদের হাতে চলে যাবে। কিন্তু পারীকুট্টির কাছ থেকে টাকা ধার করা মেনে নিতে না পেরে কারুতাম্মা চাকীকে প্রশ্ন করে, "মানুষকে এমনভাবে ঠকালে সাগর - মা রাগ করবেন না ? .... আচ্ছা মা ঔ সাদাসিধে লোকটাকে ঠকিয়ে নৌকা আর জাল কেনা উচিৎ ? এটা কি ঠিক কাজ করছো তোমরা ?" এসব কথা মোটেও ভালো লাগে না চেম্মনকুঞ্জ অথবা চাকীর। শেষ পর্যন্ত পারীকুট্টীর থেকে ধারের টাকা ও শুটকি মাছ অগ্রিম নিয়ে তা বিক্রির পয়সায় চেম্মনকুঞ্জের নৌকা ও জাল কেনা হ'ল। এ ঘটনায় সাড়া পরে গেল জেলেপাড়ায়। পড়শী আচ্চাকুঞ্জেরা খুব খুশী; সে ভেবেই পায় না কীভাবে এতগুলো পয়সা বন্ধু জমিয়ে উঠল ! সেও কিনবে নিজের জাল, নিজের নৌকা - স্ত্রী নাল্লপেন্নকে বলল। ওদিকে কোচ্চুভেল, রামন মুপ্পন, আয়ানকুঞ্জ সকলে মিলে পরশ্রীকাতর হয়ে চেম্মনকুঞ্জের মুন্ডপাত করতে লাগল 'ধিঙ্গি মেয়ের' বিয়ে না দিয়ে নৌকা-জাল কেনা কেউ মেনে নিতে পারল না। জেলেদের জাত, আরায়ন, ওয়ালাকারণ, মুকাওয়ান, মরয়াকান, আর বালন। এদের মধ্যে মোড়লরা শুধুমাত্র ওয়ালাকারণ'দের ই নৌকা জাল কেনার অধিকার দিয়েছে, তাও অনেক দক্ষিণার বিনিময়ে। চেম্মনকুঞ্জ মুকাওয়ান। সে গাঁয়ের মোড়লকে না জানিয়েই পাল্লিকুন্নাথা গ্রামের কান্ডনকারানের নৌকাটি কিনেছে। এসব

জানিয়ে রামন মুপ্পন'রা গেল মোড়লকে অভিযোগ জানাতে। মোড়ল বলল - "আচ্ছা, ও নৌকা নিয়ে আসুক। ওর নৌকায় মজুরি খাটতে কে যায় আমাকে জানবি"। ভয় পেয়ে গেল চাকী; ইতিপর্বে মোড়লের কোপে পড়ে অনেক জেলে পরিবারের সর্বনাশ হয়েছে সে কথা শুনেছে। একদিকে মেয়ের নামে কলঙ্ক অন্যদিকে মোড়লের রোষে সমাজচ্যুতির ভয় গ্রাস করছিল চেম্মনকুঞ্জের পরিবারকে। কিন্তু চাকী ঘুরে দাঁড়িয়ে সে কাকুঞ্জকে বলেঃ "মোড়ল আমাদের কী করবে শুনি? অত কি তার ধার ধারি। কিছু করতে এলে হয় মোছলমান হব না হয় খেস্টান হব"।

নৌকা কেনার পর তা জলে নামাতে আরও পাঁচশ টাকা দরকার। সে টাকা জোগাড় করে চেম্মনকুঞ্জ বারোজনের একটা দল বানাল নৌকার ; সে দলে ছিল না তার এতদিনের পুরানো বন্ধু আচ্চাকুঞ্জ। নৌকা নামানো আগের দিন পূজা হ'ল। পারীকুট্টি সমুদ্রে ধারে সেদিন কারুতাম্মার দেখা পেয়ে বললঃ "মাছ ধরে আমায় বিক্রি করবে তো ?" কারুতাম্মা উত্তরে বলেছিলঃ "ভালো দাম পেলে নিশ্চয়ই করব"। একথাটি প্রণয়জনিত লজ্জাবোধ থেকে উচ্চারিত হলেও অদ্ভুতভাবে মিলে গেল পারীকুট্টীর জীবনে। প্রথমদিন চেম্মনকুঞ্জের নৌকা সাগরে বেরোনোর শুভক্ষণে নিরকুন্নাথ গ্রামের সমুদ্র সৈকতে চাকী ছাড়াও উপস্থিত ছিল পারীকুট্টী। সেদিন মাছ পড়ল খুব; কিন্তু নৌকা তীরে ভিড়লে নগদ ছাড়া কাউকে মাছ বেচল না চেম্মনকুঞ্জ। এমনকী পারীকুট্টীকেও না। পারীকুট্টি জিজ্ঞেস করল - "কি গো চেম্মনকুঞ্জ আমার কাছে মাছ বিক্রি করবে তো ?" চেমনকুঞ্জ এমনভাব করল যেন পারীকুট্টীকে সে জীবনে কোনোদিন দেখেইনি। সেই ভাবেই বলল, "বলি নগদ টাকা আছে ? আমার টাকা চাই"। এভাবেই নিজের জাল নৌকা নীয়ে চেম্মনকুঞ্জ পয়সা করতে উঠে পড়ে লাগল। গরিব জেলে থেকে সে শুরু করল তার বড়লোক হয়ে ওঠার স্বপ্নযাত্রা। নাল্লপেল্ল, পারীকুট্টি, আচ্চাকুঞ্জ সবাইকে সে ভুলে গেল। শুধু অর্থের পেছনে ছুটতে থাকল চেম্মনকুঞ্জ, "এখন ও এক নতুন চেম্মনকুঞ্জ, হাতে ও এখন অনেক টাকা, গেয়ে ওর এখন অনেক শক্তি, মনে ওর নতুন আনন্দ আর প্রেরণা" মাঝি হিসেবেও সে সকলের থেকে শারীরিকভাবে সমর্থ, পৌরুষ তার দৃপ্ত, কৃপণ তার স্বভাব। তার জালে যে পরিমাণ মাছ পড়ে অন্য কারুর সেই পরিমাণ পড়ে না। ফলত চেম্মনকুঞ্জের ভাগ্য ফিরতে লাগল। অন্যদিকে পারীকুট্টি অবস্থা খারাপ হতে থাকল। আজকাল পারীকুট্টীর আড়তের ঝাঁপ প্রায়ই বন্ধ থাকে। হাতে টাকা না থাকায় বেচাকেনা কিছুই সুবিধামত হচ্ছে না। ব্যবসাপত্রর অবস্থা ভালো নয় দেখে আবদুল্লা একদিন তাকে খুব ধমকাল - সেকথা শুনতে পেয়ে কারুতাম্মা আরও লজ্জা ও বিড়ম্বনায় পড়ে গেল। বাবা - মা কে টাকাটা ফেরৎ দেবার জন্য পীড়াপিড়ি করতে থাকল। চাকীকে নিয়ে তখন চেম্মনকুঞ্জ সুখী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। কান্ডানকোরানের বউ এর মত মোটা করে তুলতে চায় সে নিজের বউ চাকীকে।

টিপ্পনী

এর মধ্যে একদিন সমুদ্রের জলের রং বদলে গেল ; জেলেরা একে বলে থাকে সমুদ্রদেবীর ঋতুস্রাব। এ সময় মাছ ধরার নিয়ম নেই। দু - তিন দিন নৌকা নামানো গেল না ঠায় বসে বসে কাটল। চেম্মনকুঞ্জের মাথায় এল সমুদ্রে বড়শি ফেলার কথা; সকলেই অবাক হল তাতে। এসময় সমুদ্রদেবীকে বিরক্ত করলে অভিশাপ লাগে। কিন্তু দিন আর যায় না, সকলের টাকায় টান পড়তে লাগল। চেম্মনকুঞ্জের কাছে টাকা ধার চাইতে এল অনেকেই। এমনকী সেই রামনকুঞ্জও দেড়শ টাকা ধার নিয়ে গেল চেম্মনকুঞ্জের কাছ থেকে। নিজের সুন্দর নৌকাটা চেম্মনকুঞ্জের কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হল সে। চাকীর বেশ মজা লাগল বিষয়টা। নৌকার অন্য জেলেরা অভাববশত টাকা ধার করতে এলে চেম্মনকুঞ্জ তাদের কে সুদুর সমুদ্রে বড়শি ফেলার প্রস্তাব দিল। সবাই না গেলেও কয়েকজনকে নিয়ে সে সত্যিই গেল এবং ফিরে এল মাছ নিয়ে। অল্প দামে সে মাছ বাকিদের দেবার ফলে সকলের ঘরে উনুন জ্বলল, রান্না হল। এই অভাবের মধ্যে সুদখোর আউসেফ-গোবিন্দ টাকা থলি ভর্তি করে জেলে পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদের কাছে টাকা নেওয়ার অর্থ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া - সেকথা চেম্মনকুঞ্জ ভালোভাবেই জানে। পারিকুট্টি এই মরসুমে মাছ কেনাবেচার চেষ্টাই আর করল না। বাপজান তাকে আড়তের ঝাপ তুলে দিতে বলেছে। আবদুল্লার ইচ্ছে মাছের ব্যবসা বন্ধ করে পারীকুট্টী অন্য ব্যবসায় মন লাগাক। কিন্তু হবার নয়।

> "সত্যিই আবদুল্লার এখন খুব কষ্টেই চলেছে। আগে কিছু জমিজমা ছিল, এখন তাও গেছে একটা মেয়ের বিয়ে দিতে এখনও বাকি। বিয়ের কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে আছে। আবদুল্লা তাই ও র সব দুঃখকষ্টের কথা ছেলেকে খুলে বলল - কিন্তু পারীকুট্টি তার মত বদলাল না। ও ওই সমুদ্রের ধার ছেড়ে নড়বে না আর যদি ব্যবসাই করে তাহলে মাছের ব্যবসা ছাড়া আর কিছু করবে না।"

ওদিকে পারীকুট্টীর টাকা শোধ দেবার সময় কারুতাম্মা তার মা'র মাধ্যমে বাবার কানে তুলে চায়; বাবার এই অন্যায় কার্পণ্য ও লোক ঠকানোর বিষয়টি সে মেনে নিতে পারে না। মা কে সে পারীকুট্টীর ব্যবসা বন্ধের কথা বলে। কিন্তু বুঝতে পারে বাবার সে টাকা ফেরৎ দেবার মতলব নেই। নিজের বিয়ে করার কথা মাকে বলে কারুতাম্মা; জেলের মেয়ে সে, জেলেনি হয়েই তাকে মরতে হবে। ভুলতে চায় সে পারীকুট্টীকে কিন্তু তা কি সম্ভব ? সমুদ্রের ধারে ধারে পারীকুট্টীর ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে কারুতাম্মার।

সমুদ্রতীরের প্রতিটি জেলে পরিবার বৃষ্টির মরসুমে প্রতীক্ষা করতে থাকে। কাপ্পা আর ফেনা ভাত খেয়ে দিন কাটে তাদের। অবশেষে তুমুল ঝড় - তুফানের মধ্যে বৃষ্টি নামে ;

> "মনে হল বৃষ্টি যেন জেলেদের ছোটো ছোটো ঘরগুলো সব ভাসিয়ে নিয়ে

> সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। বৃষ্টি থামলে পর স্রোতের টান দেখে জেলেরা বুঝতে পারল যে মাছের ঝাঁক এবার ওদের ওই সমুদ্রের কাছাকাছিই আছে। দেখেশুনে আনন্দে আর উৎসাহে অর্ধোপবাসী জেলেদের ম্লান চোখগুলো আনন্দে ঝকঝক করে উঠল। দু'একদিনের মধ্যেই ওদের সমুদ্রের ধারটা হয়ে উঠবে একটা ছোটখাট শহর।"

টিপ্পনী

বৃষ্টি থামলে সমুদ্রের জল শান্ত হয়ে এল। এবার নৌকা ভাসাবার পালা। সকলেই জানে চেম্মনকুঞ্জের ভাগেই সবচেয়ে বেশি মাছ উঠবে। মাঝি হিসেবে তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে - একথা সবাই মানে। সে যে অপ্রতিরোধ্য ; কাদের মিঞা বলে - 'চেম্মনকুঞ্জকে হারিয়ে দিতে কেউ পারবে না'। একদিনে দুবার মাছ ধরার রেওয়াজ জেলেদের মধ্যে নেই; তা সত্ত্বেও চেম্মনকুঞ্জ তার সঙ্গীদের বলে 'তোরা সব এক্কেবারে গাধা। ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। আর তোদের স্বভাবও অতি বদ। একটু হাওয়া লাগলেই তোরা ধানের শিসের মত টলতে থাকিস। এখন হচ্ছে দু'পয়সা কামাবার সময়। এখন যেন ভাত খেয়েই নেশা - ভাং করতে যাস নি। আমি আর এক খেপ মাছ ধরতে চাই'। আচ্চাকুঞ্জ ব্যঙ্গ করলে সে বলে 'আরে যা যা - নিয়মের কথা মাকে শোনাস না'। বিকেলের দিকে সেদিন চেড়িয়ারি, ত্রিকুন্নপুড়া সবদিক থেকে নৌকাগুলি সমুদ্রের ধারে এল। বিকেলে মুশলধারে বৃষ্টি হওয়ার ফলে নৌকা নামানো যায় নি। পরের দিন সকালে নৌকা নামিয়ে চেম্মনকুঞ্জ মাছ ধরতে গেল। কিন্তু ফেরার সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

> "সেদিনও চেম্মকুঞ্জের নৌকা সকলের আগেই ফিরছিল কিন্তু আরও একটা নৌকা খুব তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে চেম্মনের নৌকার সমান সমান যাচ্ছিল। চেম্মনের নৌকার সঙ্গে পাল্লা দেয় কার নৌকা জানতে সকলের খুব কৌতুহল হল। নৌকাটা এসেছে ত্রিকুন্নাপুড়া থেকে। হালেতে দাঁড়িয়ে আছে এক সবল সুস্থ জোয়ান ছেলে।"

এই ছেলেটা পালানি। ত্রিকুন্নপুড়ার ছেলে, পিতৃমাতৃহীন - দুই কুলে যার কেউ নেই। দুটি নৌকাই একসঙ্গে তীরে ভিড়ল, দুটি নৌকাতেই ভর্তি ছিল মাছ। 'তীরে যারা দাঁড়িয়ে আছে এক একটা নিমেষ যেন এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে'। মাছ কেনাবেচায় কিন্তু এই জোয়ান ছেলেটির কাছে হেরে গেল চেম্মনকুঞ্জ। সকলেরই মনে ধরেছে এমন মন্দ একটা জোয়ান ছেলেকে। বাড়িতে ফিরে চেম্মনকুঞ্জ নিজের স্ত্রীকে বলে, "ছেলেটাকে জামাই করতে পারলে মন্দ হয় না কি বলিস"। চাকীর খুব ইচ্ছে তাকে বাড়িতে ডেকে খাওয়ায়। পরদিন দুপুরে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর সময় পালানিকে নিজের মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিল চাকী। বিনা চিন্তায় তৎক্ষনাৎ রাজি হয়ে গেল পালানি।

> "ছেলেটা দেখতে শুনতে ভালই। কিন্তু একদিকে ভাল হলে অন্যদিকে

তেমন ঘরবাড়ি নেই, আপনার বলতে কেউ নেই - একেবারে বাউন্ডূলে। এমনিভাবে একটা চালচুলোহীন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে ভবিষ্যতে যদি কোনো গোলামাল ওঠে তাহলে কি করবে, কাকে বলবে।"

চেম্মনকুঞ্জ কিন্তু বলল, 'আরে অত ভাবার কি আছে? ছেলেটা ভালোই'।

লোকে যদি জিজ্ঞেস করে মেয়ের বিয়ে কোঠায় দিচ্ছ, তো সে কি বলব?'

'ও নিজের ঘরবাড়ি করে নেবে'।

... আচ্ছা - ছেলেটার জাত জানতে পারলাম না'।

'মাছমারা ছেলের আবার জাতপাত কি? ও হচ্ছে সাগরমার ছেলে'।

আমি মেয়ের বিয়ে ওর সঙ্গে দেবই। সে একা পড়ে যাই আর না যাই'।

এভাবেই চেম্মনকুঞ্জ আর স্ত্রী চাকী মেয়েকে পার করতে উদ্যত হয়ে পড়ল। এদিকে মরসুমের কটা ভালো দিনের পর আবার জেলেদের জীবনে ঘনিয়ে এল দুর্দিন। মাছের ঝাঁক সরে গেছে সমুদ্রের অন্য পাশে। কারুতাম্মা জানতে পারল বাব পালানির সঙ্গে তার বিবাহের সম্পর্ক করছে। কিন্তু অনেক যন্ত্রণা নিয়েও সে চলে যেতে চায় তার আগে পারীকুট্টীর ধার শোধ করা সম্ভব হয়। নিজেকে অপরাধী মনে হয় পারীকুট্টীর কাছে। মা-মেয়ে একত্রে চেম্মনকুঞ্জের বাক্স থেকে টাকা সরাতে থাকে সেই টাকা শোধ করার জন্য।

নবম অধ্যায়ে কারুতাম্মার বিয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। চেম্মনকুঞ্জ মেয়েকে বিবাহ দেবার মধ্যে পালানিকে পেতেও সমপরিমাণে আগ্রহী। খুব বেশি পয়সাকড়ি খরচ করতেও তার আগ্রহ নেই। "খুব একটা কিছু ঘটাঘটি করার ইচ্ছে চেম্পনকুঞ্জের ছিল না। যাতে খরচ বেশি না হয় সেই দিকেই ওঁরা নজর দিচ্ছিল। পালানির কেউ না থাকায় একদিক দিয়ে বেশ সুবিধেই হল। কেউ কিছু বলার বা জিজ্ঞেস করার নেই। এই চাই, ওই চাই করে হাজারটা দাবী দাওয়া নেই। পালানি গাঁয়ের মোড়লকে পানসুপারি আর কিছু দক্ষিণা দিতে চেম্পনকুঞ্জ পালানির সঙ্গে গিয়েছিল। নিজের গাঁয়ের মোড়লকে চেম্পনকুঞ্জ দক্ষিণা দিয়ে সন্তুষ্ট করল"। চাকীর সঙ্গে কারুতাম্মার কথাবার্তায় চাকী বুঝতে পারে কারুতাম্মার মনের অবস্থা। অন্যজাতের ছেলেমেয়ের ভালবাসার কাহিনি ইতিপূর্বে শুনেছে কিনা মাকে জিজ্ঞেস করে কারুতাম্মা। সেই রকম সামাজিক ভাবে অবৈধ প্রেমের কাহিনি। চিন্তিত মা'কে সে বলে "না মা, আমি নষ্ট হইনি"। দুজনের কথাতেই ঠিক হয়ে গেল বিয়ের দিনই কারুতাম্মাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ত্রিকুন্নাপুরায়, নতুন সংসারে। প্রতিবেশীরা সকলেই নানাবিধ জ্ঞান দিতে লাগল তাকে। কুঞ্জপেন্ন, নাল্লাপেল্লরা কারুতাম্মাকে ভীষণভাবে জেলেনির ধর্মরক্ষার কথা শোনাতে থাকল। সমুদ্রের ধারের নষ্ট মেয়ের লোককাহিনিও তারা শোনাল; সে নষ্ট মেয়ের জন্য কীভাবে সমুদ্রে

উঠেছিল বিষাক্ত, বিরাট ঢেউ, অতিকায় সামুদ্রিক জন্তুরা হাঁ করে জেলেদের নৌকাকে ধাওয়া করেছিল। শেষদিন সমুদ্রতীরে কারুতাম্মা দেখা করল পারীকুট্টীর সঙ্গে; তার বাঁশির ডাকে সাড়া দিয়ে। নিজের বিবাহের কথা পারীকুট্টীকে বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল কারুতাম্মা। কিন্তু হতাশ আহত পারীকুট্টি বলল, "কারুতাম্মা তুমি কাঁদছ কেন? পালানি খুব ভাল ছেলে, সে তোমাকে সুখে রাখবে ..... এই তোমার ভাল"। দুজনের মধ্যে কথা হল এরকম, "ছোট মিয়া, তুমি আর আমাকে ভালবাস না?"

> "একথা কেন বললে কারুতাম্মা - আমার বিশ্বাস কর কারুতাম্মা, এখন জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা তোমার সুখ। আমি সমুদ্দুরের ধারে এমনিভাবেই চিরকাল গান করব"।

দশম অধ্যায়ে কারুতাম্মার বিবাহের বর্ণনা আছে। নিঃসহায়, নিঃসম্বল, অটুট পৌরুষের অধিকারী পালানি গ্রামের কয়েকজনকে নিয়ে বিয়ে করতে এসে কীভাবে কারুতাম্মাকে সেই রাতেই ত্রিকুন্নপুরায় নিয়ে চলে গেল। চেম্মনকুঞ্জের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এই প্রথম প্রকাশ্যে কারুতাম্মা পালানির সঙ্গে চলে গেল। চেম্মনকুঞ্জ মনে খুব আঘাত পেল। মোড়লকে অনুরোধ করেও সে কন্যা ও জামাতাকে রাখতে পারল না। কেরলের জেলেদের মধ্যে একটা প্রথা চালু আছে যে, বিয়ের সময় কণের গ্রামের মোড়ল বরকে একটা টাকার পরিমাণ বেঁধে দেয়; বর সেই টাকা দিলে মোড়ল ও কনের বাবা সেই টাকা ভাগাভাগি করে নেয়। কারুতাম্মার বিয়েতে মোড়ল পঁচাত্তর টাকা বেঁধে দিল। বরকর্তা অচ্যুতন এর ফলে খুব রেগে গেল; এতগুলো টাকা পালানি কোথা থেকে পাবে। ওদিকে বরপক্ষের পাপু সেখানেই কারুতম্মার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করল; মেয়ের কোনো দোষ আছে বলেই তাড়াতাড়ি তাকে বিবাহ দিয়ে গাঁ ছাড়া করতে চাইছে চেম্পনকুঞ্জ। বিবাহের ভোজনপর্ব হয়ে গেলে পালানি নতুন বৌ নিয়ে ত্রিকুন্নাপুরা চলে গেল। চাকী মেয়ের অপবাদের ভয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার ইচ্ছেতে সায় দিল। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জ এই অপমান মেনে নিতে না পেরে কারুতাম্মাকে তাজ্যকণ্যা করল।

একাদশ থেকে বিংশতি অধ্যায়:

একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায় জুড়ে কারুতাম্মার নতুন শ্বশুরবাড়ির সমাজ, তার অভ্যর্থনা, পালানির সম্পূর্ণ নতুন সংসার তিল তিল করে গড়ে তোলার বর্ণনা। পিতৃমাতৃহীন পালানির সংসারের নতুন গৃহিনী কারুতাম্মা; পড়শির থেকে বাসন, শলা চেয়ে এনে খাবারের জোগাড় করতে হয় তাকে। সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্ত বিষয় জোগাড় করার মধ্যে দিয়ে এবং পালানির উন্নতির জন্য যথাসাধ্য প্রাণ ঢেলে দিল সে। নতুন সংসারের উদ্দীপনার মধ্যে এক নতুন পরিচিত সে পাচ্ছিল পড়শিদের মধ্যে। নিজের বাবা- মা চাকী চেম্পনকুঞ্জের সংসার

টিপ্পনী

পরিকল্পনা সে চোখের সামনে দেখিল; ঠিক সেই ভাবেই পালানির মাছের ব্যবসার খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করে দিল কারুতাম্মা। পালানি যাতে হিসেব করে চলতে শেখে সেজন্য তার উদ্যোগের অভাব ছিল না। অন্যদিকে বাপের বাড়ির যাওয়ার ব্যাপারে পালানি কঠোর; সে চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতে চায় না। খুব বেশি আপত্তি করতে পারে না কারুতাম্মা। সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে পালানির জন্য অপেক্ষা করে থাকে কারুতাম্মা। পড়শিদের কাছ থেকে জানতে পারে আজ প্রচুর মাতিমাছ পড়েছে। মাঝিরা সেই আনন্দে আরিপাঠ শহরে ফুর্তি করতে গেছে। কারুতাম্মার মনে পড়ে তার গ্রামেও মাঝিরা এভাবে যেত আলেপ্পি শহরে। পালানি সিল্কের 'নেরিদ' দেখায় কারুকে; বউয়ের জন্য মেলায় যাবার জন্য নতুন কাপড় কিনে নিয়ে আসে। অযাচিত উপহারে উদ্বেলিত হয়ে পড়ে কারু। পালানিকে নিজস্ব জাল - নৌকা কেনার প্রস্তাব দিলে বলে -

> "দ্যাখ, জেলেরা টাকা জমাতে পারে না কোনোদিন - কারণ খুব সোজা। তারা কীভাবে টাকা কামায় তা একবার ভেবে দেখ। কত লক্ষ লক্ষ অবলা জীবের প্রাণ নষ্ট করে ঐ টাকা তারা রোজগার করে। মাছগুলো কেমন আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। তারা তো কারুর ক্ষতি করে নি। কিন্তু তাদের ধোঁকা দিয়ে ধরে জেলেরা টাকা কামায়। সেই লক্ষ কোটি জীবগুলো যখন দম বন্ধ হয়ে ছটপট করতে করতে তাদের লক্ষ কোটি চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে মরতে থাকে তখন কী তারা শাপ দেয় না' এমনই ভাবে জীবহত্যা করে যে টাকা রোজগার হয় সেই তাকা কী জমিয়ে রাখা যায়? আর ঐ অসহায় জীবগুলোর অভিশাপেই তো জেলেদের অর্ধেক দিন উপোষ দিতে হয়।"

পালানির এই জীবনদর্শন তার পৌরুষপূর্ণ জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু নীরকুন্নাথ যাওয়ার কথা শুনলেই সন্দেহ করে কারুতাম্মাকে। তাদের দাম্পত্য জীবনে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে উন্মাদের মত হাল ধরে আরও গভীরে যেতে চায় পালানি; সঙ্গীরা তাকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনে। তার এই অবস্থার জন্য সকলে দায়ি করে কারুতাম্মাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই উপন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নেয়। বিয়ের চারদিন পর মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে নিতে আসার যে রেওয়াজ চালু আছে তা পালন করে না চেম্পনকুঞ্জ। সমাজে প্রচলিত লোকবিশ্বাস হ'ল এরকম হলে কন্যার অমঙ্গল হয়। অসুস্থ চাকীর অনুরোধ সত্ত্বেও চেম্পনকুঞ্জ নিজের অহঙ্কার ছড়াতে পারে না। সমাজে কথা ছড়িয়েছে কারুতাম্মার সতীত্ব নিয়ে; অথচ কারুতাম্মা বাপের বাড়ি যেতে চাইলেও পালানি তাকে সেখানে যেতে দেয় নি। ফলত দুই পৌরুষের অহংকারের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে কারুতাম্মার ওপর এসে পড়েছে সমস্ত

টিপ্পনী

দায়। নিরুপায় কারুতম্মা পারীকুট্টীর মত এক মুসলমান যুবককে আঁকড়ে ধরছে শেষ পর্বে। সে জানে পারীকুট্টী ও কারুতাম্মা পরস্পরকে ভালোবাসে। তাদের সম্পর্ক সমাজ নিষিদ্ধ - তাই চাকী পারীকুট্টীকে 'ভাই' সম্পর্কের আবরণে বাঁধতে চেয়েছে। শয্যাশায়ী মৃত্যুপথযাত্রী চাকীর মুখের দিকে চেয়ে এই সম্পর্ককে মেনে নিতে হয়েছে পারীকুট্টিকে। পরবর্তীতে এই দায় পালনের জন্যই তার সক্রিয়তা নিজেদের ট্রাজেডিকে আরও ঘনীভূত করেছে। চাকীর মৃত্যুর পর চেম্পকুঞ্জের জীবনে নেমে আসে চরম অনীশচয়তা ও বিশৃঙ্খলা। মাতৃহীন পঞ্চমী নাল্লপেল্ল আশ্রয়ে চলে যায়। চাকীর মৃত্যুর খবর নিয়ে পারীকুট্টী সশরীরে হাজির হয়েছে পালানির বাড়িতে, সেখানে কারুতাম্মা থাকে। পালানির অনুপস্থিতে তার বাড়িতে পারীকুট্টীর উপস্থিতি হওয়া সেই সমাজে কারুতাম্মার বিরুদ্ধে নিন্দা ছড়িয়েছে। পালানি তাতে চরম হতাশ হবেছে। সে চেয়েছিল স্ত্রীকে ভালবেসে সংসার করতে। গভীর মানসিক যন্ত্রনায় শান্তি হারিয়ে ফেলল পালানি। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে তাদের সাংসারিক কষ্টের চিত্র উঠে আসে। পালানিকে নিজের বাল্য প্রণয়ের সম্পর্ক জানিয়েছে কারুতাম্মা; কিন্তু তা সহজভাবে নিতে পারে নি পালানি। পারীকুট্টির সঙ্গে বাল্যপ্রণয়ের সম্পর্ক তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। মারামারি হয় পালানি ও পাপুর; গ্রামের লোক পালানিকেই দায়ী করে। সে হালে বসে না ; মাছ কম উঠছে তাই সে ভাগও কম পায়। সাংসারিক অনটন কাটাতে কারুতাম্মাকে মাছের ঝুপড়ি নিয়ে বেরোতে হয়। অনভিজ্ঞতার জন্য পেরে ওঠে না। পরে বাঁধা খরিদ্দার ঠিক করে আসে। অন্য জেলেনিদের ঈর্ষার শিকার হতে হয় তাকে। কারুতাম্মা জেলেনির সতীত্বের প্রশ্ন নিয়ে লোকনিন্দার ফলে পালানিকে নৌকায় নিতে চায় না সঙ্গীরা। একদিন তাকে ফেলে রেখে ভোররাতে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে নৌকা। একা পালানি; সমুদ্রের সন্তান সম্পূর্ণ একা। প্রচন্ড মনকষ্টে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ঘরে ফিরে সে কারুতাম্মাকে দায়ী করে এই পরিনতির জন্য। পালানির রাগ, দুঃখ, অসন্তোষ, রূঢ়তা সমস্ত কিছুই কারুতাম্মার মনে তীব্র প্রভাব ফেলে । সে ভেঙ্গে পড়ে।

এরই মধ্যে তাদের সন্তান আসে। পালানির কাছে এ এক আশ্চর্য প্রাপ্তি। অসীম সাহসী পালানি কারুতাম্মাকে আশস্ত করে তাকে সাগরময়ের থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারুর নেই। সে সাগর মায়ের সন্তান। মাঝরাতে লুকিয়ে বঁড়শিতে মাছ শুরু করে পালানি। নতুন জীবন-সংগ্রাম শুরু করে সে। সমুদ্রের নৌকাগুলি আর সংসারের সন্তান তাকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে কাহিনি পুনরায় ফিরে আসে নীরকুন্নাথ গ্রামে । চেম্পনকুঞ্জে দ্বিতীয় বিবাহ সূত্রে এই পর্যায়ে একটি উপকাহিনি জন্ম নিয়েছে। চাকীর মৃত্যুর পর বিপর্যস্ত চেম্পনকুঞ্জ আচ্চাকুঞ্জের পরামর্শে কান্ডানকোরানের বিধবা স্ত্রী পাপীকুঞ্জকে বিবাহ করেছে। চাকীর জীবিত অবস্থাতেও কান্ডারকোরানের স্বচ্ছল জীবনের প্রতি লোভ ছিল। কিন্তু

টিপ্পনী

পাপীকুঞ্জের ছেলে গঙ্গাদত্তন যেমন চেম্পনকুঞ্জের ঘর মেনে নিতে পারে নি তেমনই চাকীর কন্যা পঞ্চমীও মেনে নিতে পারে নি পাপীকুঞ্জকে। চাকীর সঙ্গে সংসার সামলানোর প্রতিতুলনায় পাপীকুঞ্জের বিড়ম্বনা আরও বেড়েছে।

আউসেপের কাছে টাকা ধার করতে চেম্পনকুঞ্জকে উদ্বেজিত করে পাপীকুঞ্জ। এজন্য নিজের নৌকা বন্ধক রাখতে পিছপা হয় না সে। আউসেপের ধার করা টাকা থেকে নাছোড় গঙ্গাদত্তনকে কিছু টাকা দিতে বাধ্য হয় পাপীকুঞ্জ। পঞ্চমী একথা বাবাকে বলে দেয়। ফলত রাগে পাপী কুঞ্জকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে চেম্পন। পড়শীরা আশ্রয় দেয় পাপীকুঞ্জকে। মোড়লের কাছে অভিযোগ আসে। মোড়ল আগে থেকেই চেম্পনের বিবাহে ক্ষুব্ধ ছিল ; কারণ উপযুক্ত দক্ষিণা সে পায় নি। কিন্তু মোড়লের অভিযোগের সামনে দাঁড়িয়ে চেম্পন পাপীকুঞ্জকে নিজের রক্ষিতা বলে ঘোষণা করে এবং তাকে চোর সাব্যস্ত করে। নীচ স্বার্থপর চেম্পনের কুটিলতায় বিপর্যস্ত হয়ে পাপীকুঞ্জ নিজেও কারুতাম্মা সম্পর্কে নানা কুৎসা করে। এরফলে চেম্পন উন্মাদগ্রস্থের মত পঞ্চমীকে মারধর যেমন করে তেমনি তাকে দেখা যায় চাকীর কবর খুঁড়তে, সে কৈফিয়ৎ চাইবে তার কাছে।

উপন্যাসের শেষ পর্যয়ে চেম্পনকুঞ্জ সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত এক স্বাভাবিক মানসিক সংগঠন বিপর্যস্ত মানুষ। সে অবচেতনে উপলব্ধি করতে পারে পারীকুট্টীর বিপর্যয়ের জন্য সেই দায়ী। পারীকুট্টীর কাছে সে জানতে চেয়েছে ঋণের পরিমাণ কত ; বুঝতে পারে কারুতাম্মার প্রতি দুর্বলতাবশতই তাকে টাকা ধার দিয়েছিল পারীকুট্টি। এরমধ্যে পঞ্চমী ছেড়ে চলে গেছে নীরকুন্নাথ; দিদির সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হবার পর দুজনের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। ববাড়ির কথা বলে পঞ্চমী। পালানি পঞ্চমীকে মোটের উপর পচ্ছন্দ করলেও নিজের বাড়িতে যাওয়াটা মেনে নিতে পারে না। সে যেন নীরকুন্নাথের অশান্তি বয়ে এনেছে ত্রিকুন্নপুরাতে।

শেষ পরিচ্ছেদে মূল ঘটনা দুটি, পালানি স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় উন্মাদ হয়ে সমুদ্রে গেছে অন্যদিকে সব হারানো ভালবাসার কাঙাল পারীকুট্টী এসে কারুতাম্মার কাছে। সামুদ্রিক ঝঞ্ঝার মধ্যে পালানির পৌরুষদীপ্তি ও সেই সামুদ্রিক ঘূর্ণাবর্তেই তার মৃত্যু উপন্যাসের পরিণতিকে আরও ট্রাজিক করে তুলেছে। আবার মানসিক বিপর্যস্ত কারুতাম্মাও ফিরিয়ে দিতে পারে নি পারীকুট্টীকে। পালানি তাকে ত্যাগ করেছে, বিধর্মীর প্রতি প্রেম কখনোই সমাজস্বীকৃত হতে পারে না; ফলত কারুতাম্মা পারীকুট্টীকে সুস্থ সামাজিকতায় পেতে পারে না। এখানেই এই মানবিক প্রেমের ট্রাজেডি। সমুদ্রতীরে দুজনের মৃত্যু পরিণতিকে আরও করুণতর করে তুলেছে। শেষ হয়েছে এক মানবিক প্রেমের অসাধারণ আখ্যান।

উপন্যাসটির চরিত্র বিশ্লেষণ :

পারীকুট্টি চরিত্র :

চিংড়ি উপন্যাসটি প্রধানত নায়িকাকেন্দ্রিক। কারুতাম্মাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে দুটি পুরুষ চরিত্র আবর্তিত। তাদের উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়ন থেকেই উপন্যাস এগিয়েছে। কারুতাম্মার সঙ্গে পারীকুট্টির প্রেম এক ট্রাজিক পরিণতির দিকে এগিয়েছে। তাদের প্রেমের ব্যার্থতা ও উপন্যাসের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে লৌকিক সংস্কার ; শতসহস্র বছরের প্রাচীন লোকগাথা থেকে এই লৌকিক সংস্কার এসেছে। পারীকুট্টি ও কারুতাম্মার মধ্যে বিভেদ ধর্মের এবং সামজিকতার। তাদের প্রেম সার্থকতা পায় নি এই ধর্মের বাধার কারণেই। মানুষের জীবনের অস্তিত্ব সংগ্রামের মতই এই সামাজিকতার দায় সত্য। সেই দায় থেকে উদ্ধারের পথ এরা কেউ খুঁজে পায় নি। পারীকুট্টির আত্মবিশ্বাস, শিক্ষা, কোনোটাই এই সামাজিক সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয় নি। মুসলমানের সন্তান হয়ে বিধর্মীর প্রতি ভালোবাসার মধ্যে তার ঔদার্য আছে, কিন্তু ভালোবাসাকে বাস্তবের মাটিতে নিষ্পন্ন করতে অথবা তাকে সামাজিক স্বীকৃতির পথে এগিয়ে নিতে গেলে যে আত্মশক্তি প্রয়োজন তা কিন্তু ছিল না পারীকুট্টির মধ্যে।

পারীকুট্টী চারিত্রিক ভাবে যথেষ্ট নরম প্রকৃতির। তার কারুতাম্মার প্রতি ভালবাসা কোনো দিন সফল হবে না জেনেও সে এগিয়েছে এক অনির্দেশ্য পরিণতির দিকে। নীরকুন্নাথের মত এক সমুদ্রতীরবর্তী জেলেমাঝিদের গ্রামে সে বড় হয়েছে। পৈতৃকসূত্রে নিজের মাছের ব্যবসায় নেমেছে। কৈশোর থেকেই তার সঙ্গে কারুতাম্মার সম্পর্ক বন্ধুর মত। সেই সম্পর্ক যৌবনে পরিবর্তিত হয়েছে দুর্দমনীয় ভালোবাসায়। সমুদ্রের তীরে তীরে বাঁশি বাজিয়ে প্রেমিকা কারুতাম্মার হৃদয়ে ঝড় তোলার মধ্যেই তাদের প্রণয়ের মূর্চ্ছনার সমাপ্তি ঘটেছে। কারুতাম্মার কথাতেই সে চেম্মনকুঞ্জকে আর্থিক সাহায্য করতে এগিয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হওয়ার জন্য কোনো আক্ষেপ পর্যন্ত হয় নি। কারুতাম্মার বিবাহ ঠিক হওয়ার আগেও পারীকুট্টি জোরাল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে আসতে পারে নি। সে নিতান্তই এক রোমান্টিক নায়ক থাকতে চেয়েছে। কোনো প্রত্যাশা না করে নিজের প্রেমের স্বার্থে সব কিছু বিলিয়ে দেবার মধ্যে যে অপরিমেয় মহিমা আছে তা পারীকুট্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিঃস্বার্থ মানবিক প্রেমের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকাশের উদাহরণ পারীকুট্টি ; কিন্তু তা বাস্তবোচিত নয়, কঠিন পুরষকারের অভিজ্ঞান ও সেখানে অনুপস্থিত।

অন্যদিকে তার কারুতাম্মার সঙ্গে সম্পর্ককে কোনো অবাস্তব প্লেটনিক সম্পর্কও বলা মুশকিল। সে যথেষ্ট আকর্ষণ অনুভব করে কারুতাম্মার প্রতি। শুধু তাই নয় প্রথম দেখা হওয়ার

টিপ্পনী

দিনের যে বর্ণনা পাওয়া যায় উপন্যাসে তা থেকে স্পষ্ট হয় এক আদর্শ মানুষী প্রেম তাদের মধ্যে স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ থেকে জন্ম নিচ্ছে। জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রতীরে তাদের দেখা হয়েছে অন্যান্য সময় বাড়ির পাঁচিল বা দেওয়ালের আড়ালে কথা হবার সময়ও যেভাবে দুজনকে উত্তেজিত দেখিয়েছে তা স্বাভাবিক মানুষী যৌনতার সুস্থ লক্ষণ। কিন্তু যে পুরষকার দিয়ে কারুতাম্মার সঙ্গে প্রণয়কে বাস্তবের মাটিতে সম্ভব করা যায় তা পারীকুট্টির ছিল না। ব্যবসা শেষ হয়ে যাবার পর সে গ্রামের মানুষে কুৎসাকে বন্ধ করার চেষ্টা পর্যন্ত করে নি। সে মৃত্যুপথযাত্রী চাকীকে দেখতে গেছে এবং কারুতাম্মার ভাই বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে। চাকী মারা গেলে নীরকুন্নাথ থেকে ত্রিকুন্নপুরায় সে মাঝরাতে ছুটে গেছে কারুতাম্মাকে খবর দিতে তার বাড়িতে। এখানে কারুতাম্মার সামাজিক সম্মানের ভয় সে কিন্তু আর করে নি। শেষ পর্যন্ত দুই প্রেমিক প্রেমিকার মৃত্যু এক অনন্ত ভালোবাসার মানস অভিযাত্রার মত করে উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসে। তাদের ট্রাজিক ভালোবাসার এই বেদনার্ত পরিণতি যেন শেষ পর্যায়ে কোনো কারণ, যুক্তি পারম্পর্যের উর্দ্ধে উঠে যায়। পাঠকের এ প্রসঙ্গে মনে আসতে পারে, রোমিও - জুলিয়েট কিংবা সোহিনী - মহিয়ালের মর অমর প্রেমিক - প্রেমিকার কথা।

চেম্পনকুঞ্জ চরিত্র :

উপন্যাসটির কাহিনিতে চেম্পনকুঞ্জ চরিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের সূচনাপর্ব থেকেই চেম্মনকুঞ্জ চরিত্রটির বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এক অর্থে তাকে ‘টাইপ’ চরিত্র বলা যাতে পারে। তার অর্থগৃধুতা ও অর্থলোলুপতা উপন্যাসের ঘটনাক্রমকে প্রভাবিত করেছে ; পারীকুট্টি ও কারুতাম্মার সম্পর্কটি যেমনভাবে এগিয়েছে তার প্রতিটি স্তরে চেম্মনকুঞ্জের এই স্বভাবজনিত ক্রিয়াকর্মগুলি মোটিফ হিসেবে কাজ করেছে। চেম্মনকুঞ্জ একজন খুব ছোট জেলে। লোকের জালে সে কাজ করত। কিন্তু তার মনে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অর্থের প্রতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতি লোভ। সে পরিশ্রমী ও উদ্যোগী একজন পুরুষ। কৃপণতা তার এই জীবনসংগ্রামে সাহায্য করেছে। ছোট একজন জেলের জীবন থেকে তার উত্থান অবিস্মরণীয়। যেপথে সে অর্থসংগ্রহ করে তার মধ্যে যত অন্যায় ও বঞ্চনার কান্নাই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তার কষ্টার্জিত অর্থের মুল্য লাভ করেছে। সেই প্রতিষ্ঠা বর্ণকৌলিন্যের। যখন সেই প্রতিষ্ঠা সে পেয়েছে তখন রামনকুঞ্জের মত সুদের ব্যবসায়ীকেও তার দুয়ারে অর্থের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। আজ যদি পারীকুট্টির কাছ থেকে অর্থ ধার না করে সে রামনকুঞ্জের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিত, তাহলে তা কোনোদিনই যে শোধ করা সম্ভব হত না - তা সে ভাল মতই জানে। ঋণের জালে জড়িয়ে পড়া তো তার মত জেলের ভবিতব্য। কিন্তু সে পথ থেকে সরে এলে নিজের ভাগ্য সে নিজে তৈরি করতে পেরেছে। একটা পুরুষকারের প্রচ্ছায়া চেম্মনকুঞ্জ চরিত্রের নেপথ্যে সর্বদাই ক্রিয়াশীল থেকেছে।

চেম্মনকুঞ্জ তার নিজের সমাজ ও তার ওপর ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের চরিত্রকে সবচেয়ে ভাল চেনে। এই সমাজিক আগ্রাসনের চাপ যে অর্থমূল্যের কাছে কত ভঙ্গুর তা উপলব্ধি করা যায় চেম্মনকুঞ্জের নৌকা ও জাল কেনার পর। আসলে জেলেদের পাঁচটা জাতের মধ্যে ওয়ালাকরনরাই শুধু জাল ও নৌকা রাখার অধিকারী। গাঁয়ের মোড়লদের দক্ষিণার বিনিময়ে এই জাল - নৌকা কেনার অধিকারী হয় সে। কিন্তু চেম্মনকুঞ্জ তো মুকাওয়ান। মোড়লদের এই মাতব্বরি নিয়ে চেম্মনের অনেক পড়শীরাই ভেতরে ভেতরে অখুশী কিন্তু তারা নিরুপায়। পুণ্যন, ভেলায়ুধন, আয়ানকুঞ্জদের মধ্যে চেম্মনকুঞ্জকে পৃথক করে চেনা যায়। কান্ডানকোরানের নৌকা কেনার সময় গ্রামে কথা রটে যে দশ বছরের ধিঙ্গি মেয়েকে বাড়িতে রেখে নৌকা জাল কেনার সাধ হ'ল কী করে চেম্মনকুঞ্জের ? কিন্তু সে তার লক্ষ্যে অবিচল থেকেছে। প্রয়োজনীয় তিরিশটি টাকাও সে জোগাড় করেছে পারীকুট্টির শুঁটকি মাছের ঝুড়ি নিয়ে এসে। নৌকার টাকা, জালের টাকা জোগাড়ের পর তার সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবার সময় যেন মনে হয়, প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক ধাপ এগিয়ে গেল সে। প্রথমদিন মাছ ধরে ফেরার পর পারীকুট্টিকে সে নগদ অর্থ না থাকাতে মাছ বিক্রি করে না ; নিজের কন্যা পঞ্চমীকেও হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়। সে যেন অনেক কষ্টে এখতে পাওয়া সাফল্যকে কোনোক্রমেই হারাতে রাজি নয়। আরও সংযত করে এগোতে হবে তাকে। টাকা বাড়াতে হবে বুদ্ধি করে, কোনোভাবেই ঋণের চক্রে আবর্তিত হলে চলবে না। তাই রাত্রের অন্ধকারে পারীকুট্টির আড়ত থেকে শুঁটকি মাছের ঝুড়ি এনে বাইতে রাখে ; সেই মাছ বিক্রি করে টাকা জমিয়ে তোলে। পারীকুট্টি তাকে অর্থ সাহায্য করতে করতে নিঃস্ব হয়েছে, নিজের ব্যবসা ডুবিয়ে পথে বসেছে, পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছে সমুদ্রের তীরে। শুধুমাত্র চেম্মনকুঞ্জের মেয়ে কারুতাম্মাকে ভালবাসার জন্য তার এই অযাচিত অর্থসাহায্য। চেম্মনকুঞ্জ সেকথা মনে রাখে নি ; নিজের সামাজিক উত্থানের গতি তাকে অন্ধ করে তুলেছ। পারীকুট্টির নিঃস্ব দৈন্যতা তার কাছে কোনো গুরুত্বই পায় নি।

চেম্মনকুঞ্জ চরিত্রটির একটি ভরকেন্দ্র তার স্ত্রী চাকী। নিজের সমস্ত জমানো অর্থ সে গচ্ছিত রাখে চাকীর কাছে। সারাদিন কাজের পর চাকীর সাথে ঘুমোতে যাবার আগে তার মনে হয় দুজনে মিলে এক সমৃদ্ধ সংসার গড়ে তুলবে। বিবাহযোগ্য কন্যাকে বিবাহ দেবার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার অর্থকার্পণ্য। যখন পালানি সামনে এসেছে তার উদ্দাম পৌরুষ ও কর্মদ্যোগ নিয়ে তখনও সে ভেবেছে পালানীর অভিভাবকহীনতার কথা। নিজের কোনো ছেলে নেই পালানিই যেন সেই শূণ্যস্থান পুর্ণ করতে পারে; শুধু তাই নয় তার মাছের ব্যবসার সার্থক উত্তরসুরী হতে পারে। কারুতাম্মার বিবাহ দেবার সময় যেমন চেম্মনকুঞ্জ কারুর কথা শোনে নি, খেয়াল করে নি মেয়ের মনের মধ্যে কী চলেছে তার খবর, তেমনই পরদিন কন্যাকে কয়েকদিন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বাড়িতে রাখার আবেদন যখন খারিজ করে দিয়েছে নতুন জামাই তখন মর্মাহত হয়েছে সে। আসলে চাকীর অসুস্থতা চেম্মনকুঞ্জ চরিত্রটির ভরকেন্দ্রটিকেই নাড়িয়ে দেয়। সংসারের সমৃদ্ধি ক্রমশই স্খলিত হয়ে পড়তে থাকে। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের সময় কান্ডানকোরানের সামাজিক সম্মানের কথা যেমন তাকে আকর্ষণ করছে তেমনিই তার স্ত্রীর রূপসৌন্দর্য। বর্ণ কৌলিণ্যে অনেক উঁচুতে থাকা সত্ত্বেও স্বামীর মৃত্যুর পর পাপীকুঞ্জ অসহায়ত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন না করে তাকে রক্ষিতা প্রতিপন্ন করেছে। আত্মকেন্দ্রিকতা তার চরিত্রের অন্যতম বিষ্ট্য। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে পারীকুট্টীকে টাকা ফেরত দেবার সময় তার মধ্যে অনুশোচনার ঈষৎ ঝলক দেখা দিলেও তা আলোকময় হয়ে ওঠে নি; বরং পালানির পুরুষকারের ট্রাজিক পরিণতির সমান্তরালে তার প্রথমজীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠার সগ্রামই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে উপন্যাসে। উপন্যাসের পারীকুট্টি ও কারুতাম্মার প্রণয় সম্পর্কের টানাপোড়েন যদি প্রধান হয় তাহলে তার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে চেম্মনকুঞ্জ চরিত্রের বিবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। আর চেম্মনকুঞ্জ চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক প্রতিকী অর্থে কেরালার সমুদীরবর্তী জেলে - মাঝিদের গ্রামীণ সামাজিকতায় যে ব্রাহ্মণ্যবাদী অধিকাঠামো চেপে বসে আছে তার মধ্যে বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বর্ণকৌলিণ্যের অন্তঃস্বারশূণ্যতা প্রতীয়মান হবেছে বিভিন্ন দিক থেকে।

কারুতাম্মা চরিত্র :

কারুতাম্মা এই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র; হয়তো বা কেন্দ্রীয় চরিত্রও বলা যেতে পারে। পারীকুট্টির প্রতি তার হৃদয়াবেগ যে পথে এগিয়েছে উপন্যাসও সেই পথেই পরিণতি পেয়েছে। তার পিতা চেম্পনকুঞ্জ ছোটমিঞা পারীকুট্টীর কাছ থেকে টাকা ধার করেছে জাল নৌকার জন্য - একথা সে ভাল করেই জানে কিন্তু পিতাকে কিছু বলতে পারে নি। চাকীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছে চেম্পনকুঞ্জ যাতে টাকা ফেরত দেয়। মুসলমান পারীকুট্টির প্রতি ভালবাসা তাকে নিয়ে গেছে সংকটময় পরিণতির দিকে ; তার সমস্ত মর্মযন্ত্রণার মূলে এই বিধর্মী প্রেমিক। তাদের প্রেমের সম্পর্ক জটিলতার মধ্যে আসলে লুকিয়ে রয়েছে সামাজিক সংস্কার বর্ণবিভাজনের সামাজিকতা। নারী হিসেবে ভিন্ন ধর্মের প্রেমিকের প্রতি ভালবাসা এমনকী প্রগলভতা প্রকাশকেও দেখা হয় সন্দেহের চোখে। প্রতি মুহূর্তে কারুতাম্মাকে বাঁচাতে হয় একজন নারী পরিচয়ে। বাকী সমাজ যেন মুখিয়ে আছে তার চরিত্রে কলঙ্ক রটানোর জন্য। পারী কুট্টী ও পালানী তার জীবনে যথাক্রমে ‘দীঘির জল’ ও ‘ঘড়ার জল’ হয়ে থেকেছে।

পালানির সঙ্গে বিবাহের পর সে তাকে শুধু ভালোই বাসেনি, স্বামীর প্রতি সৎও থাকতে চেয়েছে। কিন্তু সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে গেছে তার প্রতিকূল। বিবাহের দিনেই সে পালানির সঙ্গে নীরকুন্নাথ ছেড়ে চলে গেছে নতুন সংসারে। মনে রাখতে হবে চেম্পনকুঞ্জ

কিন্তু তা ছায় নি; এক অর্থে পিতার প্রথম বিরুদ্ধাচরণও সে করেছে এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। নতুন সংসারে সে আদর্শ স্ত্রীর মতই সুখে দুঃখে পালানির পাশে থেকেছে। তার ভবিষ্যৎ উন্নতির স্বপ্নে সঙ্গী হয়েছে। পালানি তার প্রতি নিরাসক্তি প্রদর্শন করলেও সে অভিমান করেছে। কিন্তু সামাজিক প্রতিবেশ তার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ছাড়ে নি। যথেষ্ট অপমানে সে সমাজে একঘরে হয়ে থেকেছে; নিজে রাস্তায় নেমেছে উপার্জনের জন্য। কুলমর্যাদাহীন পালানি চরিত্রের আশ্চর্য দৃঢ়তার কাছে সে অবনতচিত্তে আত্মোৎসর্গ করেছে। পালানির পৌরুষ, কাঠিন্যকে সে ভালোবেসেছে এমনকি আশ্রয় করেছে।

চাকীর মৃত্যুর খবর নিয়ে যখন পারীকুট্টি স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে কারুতাম্মার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে খবর দিয়েছে তখন থেকেই ঘর ভাঙ্গার শুরু। পারীকুট্টি কেন এমন কাজ করতে গেল সে প্রশ্নও যেমন তার মনে এসেছে তেমনই তাকে সে ঘর থেকে বের করে দিতে পারে নি। কারুতাম্মার ভিতরে মা'র মৃত্যু যেমন যন্ত্রণার জন্ম দিয়েছে তেমনভাবেই পারীকুট্টির প্রতি ভালোবাসা তাকে ক্ষতবিক্ষত করছে। কিন্তু সে পালানির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। শেষদৃশ্যে স্বামী ঝড়ের রাত্রে সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পালানির হারিয়ে যাওয়া এবং প্রায়োন্মাদ পারীকুট্টির সঙ্গে কারুতাম্মার মৃত্যু উপন্যাসটিকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। গোটা উপন্যাসে জেলে জীবনের সংস্কার চরিত্রগুলির কার্যকলাপকে প্রভাবিত করলেও শেষ পর্যন্ত কারুতাম্মার পরিণতি তার দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। একদিকে নারীর আদর্শায়িত সতীত্বের ঘেরাটোপ যেমন তাকে জড়িয়ে থেকেছে অন্যদিকে কারুতাম্মার মর্মযন্ত্রণা বাড়িয়েছে পারীকুট্টির প্রতি প্রেম সম্পর্কর টান।

চাকী চরিত্র :

চাকী এই উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। দরিদ্র এক পরিবারের জেলে গৃহিনী সে। নিজে এই কথাটা সে কখনো ভোলে নি। কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তিলতিল করে দুই কণ্যাকে নিয়ে গড়ে তুলেছে তার সংসার। চেম্পনকুঞ্জ তার স্বামী বাইরের থেকে যা উপার্জন করে এনেছে তা তুলে দিয়েছে চাকির হাতে ; চাকী চালিয়েছে সংসার। চেম্পনের কাঞ্চনকৌলিন্যের মূলে রয়েছে এই সুগৃহিনী। অন্যদিকে ব্যবসায়িক সাফল্যের মাধ্যমে জীবনের প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অন্যদিকে দুই মেয়েকে এমন একটা সমাজে মানুষ করার গুরু দায়িত্ব বর্তেছে তার ওপর। বড়মেয়ে কারুতাম্মাকে নিয়ে তার শঙ্কা বিধর্মীর সঙ্গে যেন তার কোনো প্রণয় সম্পর্ক তৈরি না হয়। আবার চেম্পনের উন্নতির জন্যই পারীকুট্টির কাছ থেকে টাকা ধার করে নিজের জাল নৌকা কেনার জন্য তাকে প্ররোচিত করেছে। স্বামীর অন্যায় কাজেও সে সঙ্গী হয়েছে আবার অপরাধবোধেও ভুগেছে সে। চেম্পনের জমানো টাকা কারুতাম্মার সঙ্গে যুক্তি করে চুরি করেছে পারীকুট্টির ধার শোধ করার জন্য। বিবাহের দিনে সে অসুস্থতা সত্ত্বেও

টিপ্পনী

কারুতাম্মাকে পালানির সঙ্গে চলে যেতে বলেছে; কারণ নিজের সংসার নিজেকেই গড়ে তুলতে হয়। যেমনটা সে গড়ে তুলেছিল। কন্যার বিবাহ দেবার পাত্র হিসেবে পালানিকে তার ভাল লেগেছিল। কোনো বংশগত পরিচয় না থাকলেও পুত্রহীন চাকীর মনের মাতৃত্ববোধ বিগলিত হয়েছিল এই সর্বহারা ছেলেটির প্রতি। চাকী যখন মৃত্যুশয্যায় তখন পারীকুট্টিকেও সে কারুতাম্মার ভাই হিসেবে শপথ করিয়েছে। এখানেই তার মাতৃহৃদয়ের মানবিক উপলব্ধির জয়। অটল সামাজিক সংস্কারকে অস্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। চাকী চরিত্র না থাকলে চেম্পনকুঞ্জ চরিত্রটি এবং পারীকুট্টি-কারুতাম্মার চরিত্রের টানাপোড়ন এত সুন্দরভাবে ফুটে উঠত না।

টিপ্পনী

‘চেম্মিন’ উপন্যাসের গঠনকৌশল

তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই চেম্মিন উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট হিসেবে রেখেছেন কেরলের সমুদ্রতীরবর্তী জেলে মাঝিদের দুটি গ্রাম ও তৎসংলগ্ন জনজীবন। জেলে মাঝি ধীবর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সামাজিকতা ও সংস্কার সমস্ত কিছুই উপন্যাসের পটভূমিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। সমুদ্রতীরবর্তী জনজীবনে লোকাচার, লোকসংস্কার ও নিয়তিতাড়িত মানুষের কল্পকথা চরিত্রগুলির বিন্যাসের পিছনে এক অদ্ভুত চালচিত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছে। নীরকুন্নাথ ও ত্রিকুন্নপুরা দুটি গ্রামের মানুষজনই উপন্যাসের প্রধান কুশীলব কারুতাম্মা - পারীকুট্টি - পালানি - চেম্পনকুঞ্জ - চাকীর জীবনকে প্রভাবিত করেছে। দুটি গ্রামের নিম্নবর্গীয় পরিসরের জীবন্ত চিত্র উদঘাটিত হয়েছে উপন্যাসে। সমষ্টিজীবন বা গোষ্ঠীজীবনের ভূমিকা উপন্যাসে মোটিফের পিছনে রয়েছে। উপন্যাসের প্লট যত পরিণতির দিকে এগিয়েছে ততই এই সমষ্টিজীবনের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

‘চেম্মিন’ উপন্যাসটি সর্বোমোট কুড়িটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত পর্যায়ের দশটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে নীরকুন্নাথ গ্রামের চালচিত্রে কারুতাম্মা ও পারীকুট্টির কৈশরে প্রণয় ও পরবর্তীতে পরিণতি প্রেমসম্পর্কের বিস্তার। মাঝি ও জেলে সম্প্রদায়ের আর্থিক জীবন ও সামাজিকতায় কীভাবে চেম্পনকুঞ্জের মত কৃপণ, চালাকচতুর লোকও মহাজনী কারবার ও মোড়লদের পাকেচক্রে পড়ে যেতে পারে তার ছবি সেখানে আছে। যদিও চেম্পনকুঞ্জ নিজে নিম্নবর্গীয় মানুষ হয়েও শুধুমাত্র কাঞ্চনকোলিন্যের জোরে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। পারীকুট্টি একজন মুসলমান যুবক ; মাছ আড়তের পৈতৃক ব্যবসা কীভাবে অজ্ঞতার কারণে নষ্ট করেছে সে এবং কারুতাম্মার প্রতি অন্ধপ্রণয় কীভাবে জীবনকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েএ তারই আখ্যান এই উপন্যাসের ক্ষেত্রভূমিও সরে গেছে ত্রিকুন্নপুরায়। সেখানকার গ্রামীণ সমাজের মধ্যেও অন্ধ নিয়তিবাদের পাপপূণ্যবোধ সক্রিয়। আর শুধু তাই নয়, সেই বোধের

ওপর দাঁড়িয়ে তারা কারুতাম্মাকে অসতী আখ্যা দিতেও ছাড়েনি। দশম অধ্যায় থেকে বিংশত অধ্যায় পর্যন্ত কারুতাম্মা ও পালানির সংসার জীবনের সুখী দাম্পত্য এবং তাদের সম্পর্কের ফাটল টানাপোড়ন তৈরি করেছে উপন্যাসের প্লটে।

নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের মাধ্যমে কারুতাম্মা - পারীকুট্টি - পালানির সম্পর্কের সঙ্গে চাকী চেম্পনকুঞ্জ কাহিনির সম্পর্কটি দেখানো যেতে পারে।

কারুতাম্মা - পারীকুট্টির প্রেমককাহিনি ও তার ট্রাজিক পরিণতি এই উপন্যাসের মূল বিষয়। সেই বিষয় কয়েকটি স্তরে উপন্যাসে পর্যায়ক্রমে এসেছে। কাহিনির গতিপথ ও কারুতাম্মা - পারীকুট্টির সম্পর্কের সূত্রে এগিয়েছে।

প্রথম অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় : [স্থান : নীরকুন্নাথ]

চেম্পনকুঞ্জ - চাকীর সংসারের প্রাত্যহিকতা।

কারুতাম্মা - পারীকুট্টির বাল্য - কৈশোর প্রণয়সম্পর্কের সম্পর্কের টান।

সপ্তম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় [স্থান : নীরকুন্নাথ]

মূলবৃত্তে পালানির আগমন, কাহিনিতে টানাপোড়নের সূত্রপাত, কারুতাম্মার বিবাহ।

একাদশ অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় [স্থান ; ত্রিকুন্নাপুড়া]

পালানি - কারুতাম্মার দাম্পত্য।

চাকীর মৃত্যু

কারুতাম্মার মানসিক যন্ত্রণা।

ঊনবিংশ অধ্যায় ও বিংশ অধ্যায় :

উপন্যাস অন্তিম পরিণতির দিকে এগিয়েছে। পালানির সন্দেহ এবং লোকনিন্দা, চাকীর মৃত্যু, কারুতাম্মার মানসিক যন্ত্রণাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে সে তার মনের স্থৈর্য হারিয়ে গেছে। পালানির পৌরুষপূর্ণ জীবন নির্লিপ্তি, (যাকে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বলে ভ্রম হতে পারে) সমুদ্রে অতল ঝঞ্ঝার মধ্যে সে পাড়ি দিয়েছে - হারিয়ে গেছে সম্বলহীন মানবজীবন থেকে। তখন উন্মাদগ্রস্থ পারীকুট্টির মৃতদেহের কাছে আবিস্কৃত হয়েছে কারুতাম্মার নশ্বর শরীর। বিংশতি অধ্যায়ের এই সমাপ্তি তাদের প্রণয়ের এক ট্রাজিক পরিণতিকে সূচিত করে।

সমালোচকের মন্তব্য :

'মালায়লম সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে পি কে পরমেশ্বরণ নায়ার চিংড়ি উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। মালায়লম উপন্যাসের আধুনিকতার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে তিনি

টিপ্পনী

উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন “ গল্পটি রোমান্টিক হলেও এর প্রাকৃতিক দৃশ্য ও চরিত্র চিত্রণ বর্ণনার গুণে খুবই বাস্তব হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের পটভূমি ত্রিবাঙ্কুরের উপকূলবর্তী অম্বালাপুরা ত্রিকুন্নাপুরা অঞ্চলের জেলেদের ঘরগুলি আর এই চরিত্রগুলি হচ্ছে সমুদ্রের অবিশ্বাস্য রকমের সাহসী জেলে-জেলেনীরা। এরা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রতিমূহুর্তে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। এই উপন্যাসে কোনো শ্রেণী সংগ্রাম নেই। মনে হয় যেন লেখক তাঁর বন্ধ সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। আর বদলে এই উপন্যাসে আমরা আশ্চর্য কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাই। এখানে একদল সাদাসিধা সরলমনা লোক বাস করে। প্রেম আর নৈতিকতা সম্বন্ধে তাদের সব অদ্ভুত ধারণা, প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের অনন্ত সংগ্রাম এবং সর্বোপরি তাদের হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনার সংগ্রাম এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। এই উপন্যাসের কাহিনি এই সব জেলেদের অনেক রকম অন্ধবিশ্বাসের একটির উপর ভিত্তি করে লেখা। তারা বিশ্বাস করে যখন কোনো স্ত্রীর সমুদ্রে মাছ ধরতে আয় তখন সেই নারী যদি পরপুরুষে আসক্ত হয় তাহলে সমুদ্র মায়ের রোষে সেই মেয়ের নির্দোষ মানুষটির উপর এসে পড়ে। এইরকম একটা ধারণা বিশ্বাস করা যায় কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন কিন্তু উপন্যাসের বাস্তবতার সঙ্গে এই বিশ্বাস এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে একে অবিশ্বাস করা যায় না। এছাড়া এই বইয়ের বিরুদ্ধে আর একটা সমালোচনা করা হয় সে জীবনের রুক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে এই রকম অযৌক্তিক বিশ্বাস মিশালে তাতে পরস্পরবিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হয়, এটা আধুনিক উপন্যাসের নিয়ম কানুনের সঙ্গে ঠিক মতো মেলে না। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে গল্পটি সেই সব লেকেদের নিয়ে যাদের কাছে অন্ধবিশ্বাস সত্য এবং তা এড়ানো অসাধ্য তখন এই সমালোচনার যথার্থতা অনেকাংশই হারিয়ে যায়। আর এর চরিত্রগুলোর ট্র্যাজেডি যেটাকে সমুদ্র - মায়ের ক্রোধ বলে দেখানো হয়েছে সেটাকে দৈব ঘটনা অথবা আধিদৈবিক শক্তি ধরলে এটা যে সম্ভব হতে পারে সেটা বিশ্বাস করা যায়। তেমনি ভাবে চাত্তন যখন চিরুতাকে তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেয় তখন সেটা অসম্ভব বলে কিছু মনে হয় না। আমরা দেখতে পাই যে তথাকথিত অশিক্ষিত সমাজের আচার ব্যবহার অনেকটা চলিত প্রথা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করছে।

তাকাষি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে চলিত প্রথা ও অন্ধবিশ্বাসের প্রভাবিত একটি সম্প্রদায়ের জীবন আলেখ্য, তাদের আবেগ অনুভূতি সবকিছু বাস্তবতার সঙ্গে এঁকে দেখিয়ে পাঠকের মনকে প্রভাবিত করতে চান। তিনি দুই ভাবে এটি করতে সফল হয়েছেন। তিনি তাঁর শৈলী ও দক্ষতা দিয়ে গল্পটিতে বাস্তবতার আবহাওয়া আনতে পেরেছেন এবং সূক্ষ্মভবে অন্ধবিশ্বাস ব্যবহার করে তাঁর গল্পের তীব্রতা বাড়িয়েছেন।

অনুশীলনী ও প্রশ্নাবলী :

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী :

১. 'চেম্মিন' উপন্যাসটির পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২ . চেম্মিন উপন্যাসের ঔপন্যাসিকের সমাজবাস্তবতার পরিচয় কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে দেখাও।

৩. জেলে সমাজের জনজীবন কীভাবে 'চেম্মিন' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে একটি প্রেমকাহিনির চালচিত্র হিসেবে কাজ করেছে দেখাও।

৪. 'চেম্মিন' উপন্যাসের গঠনকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

৫. পালানি না পারীকুটি কাকে চেম্মিন উপন্যাসের নায়ক বলে মনে হয় ? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৬. 'চেম্মিন' উপন্যাসে অন্ধ লোকবিশ্বাস ও সমুদ্র কেমনভাবে গতিপথ নির্ধারণে নির্নায়ক হবে উঠেছে আলোচনা করো।

৭. 'চেম্মিন' উপন্যাসের নায়িকা কারুতাম্মা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।

৮. দারিদ্র, ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কারের বিপ্রতীপে কারুতাম্মা ও পারীকুট্টির প্রেম কীভাবে এক ট্রাজিক পরিণতির মধ্যে সম্পূর্ণতা পেয়েছে আলোচনা করো।

৯ . চেম্মিন উপন্যাসের পরিণতি এই উপন্যাসের শিল্পমূল্যের নিরিখে কতটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করো।

১০. চেম্পনকুঞ্জ - চাকীর দম্পত্যের পরিচয় দিয়ে চেম্পনের জীবনসংগ্রামের যৌক্তিকতা বিচার করো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১. টীকা লেখ : চাকী চরিত্র, পালানির জীবন।

২ . কান্ডানকোরান কে ? তার নৌকা কেন কিনেছিল চেম্মন ?

৩ . মুন্টু ও নেরীদি কাকে বলে ?

৪. গঙ্গদত্তন কে ? তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫. কারুতাম্মার বিবাহের রাত্রে কী ঘটেছিল ?

৬. কীভাবে কারুতাম্মার সঙ্গে পারীকুট্টির আলাপ হয়েছিল ?

৭. কারুতাম্মার বাবা তাকে কী বলেছিল ?

টিপ্পনী

৮. পাপীকুঞ্জ চরিত্রটির সঙ্কট কোথায়?

৯. ত্রিকুন্নাপুড়া কেমন গ্রাস? পারীকুট্টির পড়শীরা কেমন ছিল?

১০. নীরকুন্নাথের গ্রামবাসীরা মোড়লের কাছে কী অভিযোগ জানাতে গিয়েছিল?

টিপ্পনী

একক - ২ আধুনিক ভারতীয় কবিতা

টিপ্পনী

এই এককটিতে আধুনিক ভারতীয় কাব্যের একটি ভূমিকাসহ নির্বাচিত চারজন ভারতীয় কবির একটি করে কবিতা আলোচনা করা হবে। চারজন কবির কবিকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণাও পাওয়া যাবে এককটিতে। কবির সময়কাল তাঁর সাহিত্যকৃতি প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে কোনো একটি কবিতা কোনো কবির মূল্যায়ণের জন্য শেষ কথা হতে পারে না; তাই এক্ষেত্রে পাঠ্যাংশের কবিতাটির মাধ্যমে কবির মন ও মননের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা সর্বদা সম্ভব হবে না। উৎসাহী ও আগ্রহী পাঠককে এর জন্য কবির অন্য কবিতাও পড়তে হবে। এই পাঠ-উপকরণের প্রত্যেক কবির জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত একটি রেখাচিত্র, মূল কবিতাটি এবং তার প্রাসঙ্গিক তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। সেগুলি মনযোগ সহকারে পড়লেই করা যাবে কবিতাগুলির মধ্যে আরও অনেক কথা আছে যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে। শিক্ষার্থী হিসেবে এই কবি পরিচিতি নিয়ে নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে সেই ব্যাখ্যা করার।

আসাদ - উল্লাহ - খান গালিবের কবিতা :

গালিবের জীবন ও কবিকৃতি :

আসাদ-উল্লাহ-খান গালিব ভারতীয় পার্শী ও উর্দু কবিতার সর্বকালের স্মরণীয় একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর আসল নাম ছিল মির্জা আসাহদুল্লাহ্ বেগ খান। ১৭৯৭ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর গালিবের জন্ম হয় মোগল শাসনামলের আগ্রাতে মাতুলালয়ে। তিনি 'গালিব' ছদ্মনামটি ব্যবহার করতে ভালবাসতেন। 'গালিব' শব্দটির অর্থ বিজয়ী; 'আসাদ হল সিংহ। মোগল আমলের শেষ পর্যায়ে দিল্লীতে কাটিয়েছেন গালিব। ইংরেজ কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্য জয় ও সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে গালিব লিখে গেছেন। সেসব লেখা সময়ে দলিল ও অনবদ্য। তাঁর কবিতা, গজল শুধু ভারতবর্ষ নয় পাকিস্থানে আজও অত্যন্ত সমাদৃত। এক অর্থে ভারতবর্ষের মোগল সাম্রাজ্যের শেষ বিখ্যাত কবি মির্জা গালিব। ১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মির্জা গালিবের মৃত্যু হয়। আজও পুরোনো দিল্লিতে 'গালিব কী হাবেলি' একটি দর্শনীয় স্থান।

গালিবের পূর্বপুরুষ তুরস্ক থেকে সমরখন্দে চলে এসেছিলেন। তাঁর ঠাকুরদা মির্জা

টিপ্পনী

কোয়ান বেগ খান, যিনি একজন তুর্কি ছিলেন, সমরখন্দ থেকে ভারতবর্ষে উদ্বাসিত হয়ে আসেন আহমেদ শাহ - এর রাজত্বকালে (১৭৪৮ - ৫৪)। লাহোর, জয়পুর ও দিল্লিতে কর্মসূত্রে থাকার পর তিনি বুন্দেলশহর এর একাংশ উপহার হিসেবে পান ; এবং আগ্রাতে স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর চার পুত্র সন্তান ও তিন কণ্যাসন্তান ছিল। গালিবের পিতা - পিতৃব্য পর্যন্ত এই পেশাগত ঐতিহ্য বজায় ছিল। পিতা আবদুল্লাহ খান বেগ আলোয়ারের যুদ্ধে মারা যাবার পর গালিবদের পারিবারিক জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশ সরকার এবং পেনশন বরাদ্দ করে। বছরে সাত'শ টাকা পেনশনে তখন চলতে থাকে গালিবের। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর মাতামহ হয় ওঠেন গালিবের অভিভাবক। মক্তবে পড়ার সময়ের মুখে মুখে শের রচনা করে সকলকে মুগ্ধ করে দিতেন গালিব। বিভিন্ন সাহিত্য পাঠের সঙ্গে উর্দু ও ফারাসী ভাষায় দখল তৈরি হতে থাকে তাঁর। প্রথম জীবনে 'তখল্লুস' হিসেবে 'অসদ' ব্যবহার করলেও পরবর্তি জীবনে 'গালিব' নামটিই পচ্ছন্দ ছিল তাঁর। তের বছর বয়সে দিল্লিস্থিত অভিজাত লোহারু কুলের উমরাও বেগমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এরপর দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন। বিবাহিত জীবনকে তিনি কারাগার বলেছিলেন। এসময় মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কাল। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি মাসিক দশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন সম্রাটকে। লাল কেল্লায় বন্দী তাঁর সাম্রাজ্য। ১৮৩৭ সাল, দ্বিতীয় আকবর শাহের পুত্র শাহ জাফর সবেমাত্র সিংহাসন পেয়েছেন। তিনি নিজে ছিলেন উর্দু কবি। নিজের কাব্যরচনার ইচ্ছেটাকে শান দেওয়া বাদে এসময় তাঁর করার বিশেষ কিছু ছিল না। বাহাদুর শাহ জাফরের সভায় ওস্তাদ হিসেবে কাজ করতেন শা নসীর পরে কবি জওক তারপর গালিব। ১৮৫৪ সালে গালিব তখন প্রৌঢ়; সুনির্দিষ্ট মাসোহারা যেমন তাঁর পক্ষে ছাড়া সম্ভব নয় তেমনই দিল্লি শহর। এরপর সিপাহী বিদ্রোহ এসে পড়ল। সেসময় তিনি দিল্লিতে গৃহবন্দী থাকলেন। ঘরে বসে ফারসী ভাষায় লিখলেন 'দস্তাম্বু' - অর্থাৎ 'এক গুচ্ছ ফুল'। তৈমুর বংশের ইতিহাস লেখার প্রস্তাব পেয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। সরকার সেসময় তার পেনশন বন্ধ করে দিয়েছিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগযোগ সন্দেহ করে। ১৮৬০ সালে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে তিনি পেনশন পুনরুদ্ধার করেন পেনশন।

শেষজীবনে অর্থাভাব, অনটন, অসম্মান ছিল গালিবের নিত্য সহচর। শারীরিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। প্রচলিত ফারসী শব্দকোষ 'বুরহান - ই -কাতে' বইটির অসংখ্য ভ্রমসংশোধন করে গালিব প্রকাশ করেন 'কাতে - ই - বুরহান' নামে। এরফলে জানা মৌলভীরা তাকে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করতে থাকেন। সেই আক্রমণ না সামলাতে পেরে তিনি মানহানির মামলা করেন এবং চাপে পড়ে তা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। তাঁর বন্ধু ও জীবনীকার হালি এসময়র কথা বিস্তারিত লিখেছেন। হালি তখন ছিলেন সেই আক্রমণকারীদের পক্ষে। পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন তিনি। গালিব নামাজ পড়েন না এই অভিযোগের উত্তরে হালিকে

ব্যাক্তিগত পত্রে তিনি জানাচ্ছেন -

> " আমার সারাটা জীবনই তো পাপাকর্মে, অপকর্মে কাটালাম। আমি কখনও নামাজ পড়িনি, রোজা রাখিনি, অন্য কোন পূণ্যকর্মও করিনি। আর ক'দিন পরেই আমি শেষ নিঃশ্বাস ফেলব। এখন আমার আর যে ক'টা দিন বাকি আছে এই দিনগুলি যদি নামাজ পড়েও কাটাই তবু যাবজ্জীবন পাপের কী কোনো প্রতিবিধান হবে ? তার চেয়ে আমার যোগ্য শাস্তি হবে যদি আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয় - বন্ধুরা আমার মুখে কালি লাগিয়ে, পায়ে দড়ি বেঁধে আমাকে দিল্লির পথে টেনে নিয়ে গিয়ে শহরের বাইরে ফেলে আসা কা- চিল - কুকুরের জন্য - যদি অবশ্য ওরা এই অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করতে রাজি হয়।"

কী চরম মনকষ্ট সেসময় গালিব পেয়েছিলেন এই পত্র তার স্বাক্ষর বহন করে। অবশেষে ১৮৬৯ সালের ১৫ই ফ্রেব্রুয়ারি গালিবের মৃত্যু হয়। তাঁর জানাজাতে শিয়া - সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই সমবেত হয়েছিলেন ; কিন্তু নবাব জীয়াউদ্দিনের মতানুযায়ী সুন্নিমতে সেই দাফন্ সম্পন্ন হয়। মৃত্যুতেও বিতর্ক তাঁর পিছন ছাড়েনি। হালি বলেছিলেন - "কত ভাল হ'ত যদি শিয়া সুন্নি দুপক্ষই সেদিন জানজার নামাজ পড়তেন, গালিব তো দুই সম্প্রদায়কেই সমান জ্ঞান করতেন"।

ইতিহাসের সময় :

উর্দূ - ফার্সী সাহিত্যের কাব্যধারায় রুমি, খৈয়াম, হাফিজাদির কয়েক শতাব্দি পর মীর, মোমিন, দর্দ, সওদা, গলিবের আবির্ভাব। অষ্টাদশ শতাব্দির সূচনাপর্ব থেকেই মুসলিম সভ্যতা এবং ফারসী ও উর্দূ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল দিল্লি আগ্রা লক্ষণৌতে সন্নিবেশিত হয়েছে। সৌখিন মজলিশ, তোয়ায়েফ, উচ্চপর্যায়ের অভিজাত মুসলিম সংস্কৃতির পরিসরে এই গজ্‌ল সঙ্গীতের প্রসারের পটভূমি তৈরি হয়েছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রেক্ষাপটে শাহ আলমের পুত্র আকবর শাহ (দ্বিতীয়) তখন নামমাত্র বাদশাহ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাসিক দশ হাজারি বরাদ্দের ওপর দাঁড়িয়ে এই সম্রাটের বিলাসব্যসনে, কলহ-বিবাদে দিনগত অস্তিত্ব রক্ষা বাদে প্রায় কিছুই করার নেই। কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নেই। সামাজিক পরিসর ভয়ার্ত, ক্রমসঙ্কুচিত হতে যাচ্ছে। আকবর শাহের পুত্র বাহাদুর শাহ জাফর এরকম সময়ে সিংহাসন পান। যিনি নিজে কবি ছিলেন এবং গালিবকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। গালিবের জীবনের ওঠাপড়ার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এই উর্দূ কবি। এসময়ের দিল্লি এবং সিপাহী বিদ্রেহের সময়ের দিল্লির প্রেক্ষাপটে গালিবের কাব্যকৃতির বিস্তারকে প্রত্যক্ষ করি আমরা।

টিপ্পনী

উর্দূ শের ও গজল :

আমাদের পাঠ্য গালিবের কবিতাগুলি দুই পঙক্তিবিশিষ্ট। শের বা ইংরাজিতে যাকে ‘কাপলেট্’ বলে অনেকটা সেরকম। অনেক জায়গাতেই এদের মধ্যের অন্তর্নিহিত সূত্র ক্ষীণ। উর্দূ গজলের বৈশিষ্ট্য এটা যে, সেখানে পনের - কুড়িটি শের এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যেগুলির ভাবগত অন্তর্মিলগুলি ছিন্ন হলেও কিছু আসে যায় না। যদি ভাবের সে ঐক্য কোথাও থাকে সেটা ব্যাতিক্রম। আসলে দুই পক্তিবিশিষ্ট শেরই স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। জাপানি হাইকু অনেকটা এরকম। এধরনের কাব্যকণিকাগুলির আয়তন অতি সীমিত বলেই উর্দূ শায়েরদের কবিতাগুলির কায়ানির্মাণে অত্যন্ত নজর দিতে হয়। আবু সয়ীদ আয়ূবের ভাষায়, “রসস্রষ্টা হোন আর না -ই হোন, রূপদক্ষ তাঁদের হ’তেই হয়”।

মির্জা গলিবের সাহিত্যকৃতি :

বালক বয়সে গালিবের কবিতা রচনায় হাতেখড়ি। মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রথম উর্দূভাষায় কবিতা লিখতে দেখা যায় তাঁকে। গালিবের বাড়িতে ছোটবেলা থেকে ফার্শী ও আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী কালে গালিব তাঁর উর্দূ গজলের জন্য বিখ্যাত ছিল। পরবর্তী কালে গালিব তাঁর উর্দূ গজলের জন্য বিখ্যাত হলেও নিজের ফার্শী কাব্যরচনা সম্পর্কে তাঁর বড়ই গর্ববোধ ছিল। গালিবের রচনার পূর্ব গজল ওগানের মূল প্রকৃতি ছিল প্রেমমূলক। কিন্তু গালিব সেই প্রকরণ দর্শণ, মিষ্টিসিজম অনুষ্যুত করেছেন। প্রেম ব্যাতিরেকেও অন্য বিষয়ে গজল লিখেছেন গালিব। গালিবের রচনার পর গজলের দিগন্ত আরও প্রসারিত হয়ে পড়ে উর্দূ সাহিত্যে। পাশ্চাত্য প্রেম কবিতার ভাবনার পরিবর্তে সপ্তদশ শতকের শেষপর্ব থেকে ‘প্রেম বিষয়ক কবিতার’ ভাবনা উর্দূ কবিতায় স্কাষ্ট হতে থাকে। এই রূপবদল বা বাঁকবদল সম্ভব হয়েছিল মির্জা গালিবের গজলের জন্য। তাঁর গজলের প্রথম ইংরাজি অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল Love Sonnet og Ghalib এই নামে; সম্পাদনা করেছিলে সরফরাজ কে নিয়াজি। প্রকাশক ছিল ভারতবর্ষে ‘রূপা এন্ড কোম্পানি’ এবং পাকিস্থানে ‘ফিরোজ সন্স’।

গালিবের প্রথম কবিতা সংকলন লেখা হয়েছিল ১৮২১ সালে। ১৮২৮ সালে তাঁর ‘গূল এ বানা’ কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়। এরপর ‘দীবান - এ - গলিব’ উর্দূ ‘মুঅল্লা’, ‘খুতুত - এ গালিব’, ‘কাদিরনামা’, ‘মৎফরাৎ এ গালিব’ ইত্যাদি উর্দূ ও ফার্সি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গালিবের পত্র অত্যন্ত বিখ্যাত। সিপাহী বিদ্রেহের সময়কাল থেকে ফার্সী ভাষায় গালিব যে দিনলিপি লিখেছিলেন তা ১৮৫৮ সালনে মহারাণি ভিক্টোরিয়ার ভারতের শাসনভার গ্রহণের পর ‘দস্তম্বু’ নামে প্রকাশিত হয়। গালিব খুব সুন্দর পত্র লিখতেন। ইতিপূর্বে উর্দূতে পত্রসাহিত্য ছিল আলঙ্কারিক। গালিব পাঠকের সঙ্গে কথাপকথনের ঢং এ পত্র লিখতেন। অনবদ্য রসসাহিত্য ও

সময়ের কথক হয়ে উঠেছিল তাঁর পত্রগুলি। লঘু হাস্যরসের সঙ্গে ভীষণ আন্তরিক অন্তরঙ্গ টোনের সংমিশ্রণ ছিল চিঠিগুলির মূল শক্তি। সমালোচকেরা বলেন শুধুমাত্র এই পত্রগুলির জন্যই তিনি উর্দূ সাহিত্যে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকতে পারতেন।

মির্জাগালিব ১৮২৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এসেছিলেন। এই পর্বে তিনি কিছুদিন মুর্শিদাবাদে কাটান। কলকাতায় দুই বৎসর কাল অতিবাহিত করার সময় অনেক নতুন কবিতা লিখেছিলেন গালিব। শেষ জীবন পর্যন্ত সেই কলকাতার স্মৃতি তাঁকে আলোড়িত করত। দিল্লিতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় গৃহবন্দী থাকাকালীন বেশ কিছু উর্দূ কবিতা রচনা করেন গালিব। এগুলির মধ্যে কিছু উর্দু কবিতা রচনা করেন গালিব। এগুলির কবিহৃদয়ের অন্তর্দাহ এবং বিষন্নতা অপরূপ শিল্পিত রূপলাভ করেছিল। সেই উত্তাল সময়ের অভূতপূর্ব কাব্যরূপ গালিবের লেখায় পাওয়া যায়।

গালিবের লেখাগুলি থেকে যে গালিবের পরিচয় পাওয়া যায় তার ধর্মবোধ সম্পর্কে দু-চার কথা বলা দরকার। গালিব ধর্মীয় রিচ্যুয়াল বা সংস্কার খুব একটা পচ্ছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে অনেক বড় ছিল ইশ্বর - আল্লাহ কে ওয়ার আততির বিষয়টি। বিভিন্ন ইসলামী ধর্মগুরুর কঠোর নিয়মব্রত পালন বিষয়ক মতামত তাঁর কাছ বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। তা সত্ত্বেও গালিব অসাধারণ ধর্মীয় কাব্য রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন। নিজের এই ধর্মবোধ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

The object of my worship lies beyond perception's reach. For men who see, the Ka'lba is a compan nothing more.

স্বর্গ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয় নীচের লেখাটিতে -

> "In paradise it is true that I shall drink at dawn the pure wine mentioned in the Quar'an, but where in paradise are the long walks with intoxicated friends in the night or the drunken crowds shouting merrily ? Where shall I find there the intoxication of Monsoon cloud ? Where there is no autum, how can spring exits ? It the beautiful houris are always there, where will be the sadness of separation and the joy of union ? where shall we find there a girl who flies away when we would kiss her ?"

অসাধারণ এই ভাবনায় আসলে ফুটে ওঠে তাঁর মর্ত্যপ্রীতি ও জীবনের প্রতি ভালবাসার কথা। জীবনকে বড় ভালবাসতেন গালিব। সাত সন্তানের মৃত্যুর শোক যেমন সারাজীবন

বিষাদগ্রস্ত করে রেখেছিল তাঁকে তেমনই জুয়াখেলাতে গিয়ে জেলে যাওয়া, অপদস্থ হওয়া, অর্থাভাব ইত্যাদি নানা বিষয় জীবনের অন্ধকার দিকটিকে দেখতে সাহায্য করেছিল গালিবকে। আশ্চর্য হল, এই বিপদ, পরাজয়, আত্মপ্রবঞ্চনা, পরশ্রীকাতরতার মধ্যে দাঁড়িয়েও জীবনকে ভালো বেসেছিলেন গালিব। সবকিছু নিয়ে জীবনের স্বর্গে যেন তাঁর বাস ছিল। প্রবল আত্মমর্যাদা বোধ, বংশমর্যাদার প্রতি প্রচ্ছন্ন টান ও জীবনভর বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাওয়া - গালিবকে পরিণত করেছিল, দার্শনিক করে তুলেছিল। এর ছাপ তাঁর কবিকৃতিতে আছে। তিনি বলতেন সমকাল নয় আগামী প্রজন্ম তাঁকে জানবে, তাঁর রচনার মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। গালিবের কবিতায় গালিব নিজের সঙ্গে কথোপকথোন করতেন। নিজেকে নিয়ে ভাবনাও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতাগুলিতে। যেমন, -

'পুচ্ছতে হ্যায় লোগ কি গালিব কোন হ্যায়
কোই বাৎলাও কি হাম বাৎলায়ে কেয়া।'

আবার আরেকটি তে লিখেছেন, -

"হোগা কোঈ এয়সা কি গালিব কো না জানে,
শায়ের তো বহুত আচ্ছা হে পে বদনাম বহুত হ্যয়।"

কবিতার রঙরূপ স্বাদের প্রশ্নে গালিবের কোন সে অর্থে গুরু ছিল না। আত্মঅহমিকা এর অন্যতম কারণ, তাঁর কাব্যের মধ্যেও এর ছায়াপাত লক্ষ্ করা যায়। ফারসী কবিদের মধ্যে অমীর খসরু বাদে কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি গালিব। সম্ভবত তরুণ বয়সে পেদিলকে আদর্শ মানতেন কখনো কখনো। আসলে তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ততার মধ্যে গালিবের কবিতা ঠিক ভাবে মিলত না। দরকারী কবিতার চটক তো তার কাব্যে ছিল না। সেখানে ছিল কবিহৃদয়ে সত্যভাষণ। এই সত্য স্বীকারোক্তির কাব্যিক প্রকাশই ছিল গালিবের কবিতার শক্তি।

মূল কবিতাবলী :

বাংলা অনুবাদে (১-৫)

১

এই কথাটা জেনো গালিব
প্রেমের ওপর জোর খাটে না;
প্রেম তবু তার এত জোর।
জ্বালালেও জ্বলে না নেভালেও নেভে না

২

প্রেম মিলে না আমার ফিরিয়ে দিলে
আমার হৃদয় গৌরবের তা টেনে নিলে

৩

হবে এমন দিন সবাই বলে গালিবের নাম
কবিতা ভালই লেখে পিছে বড় বদনাম

৪

হৃদয়ে আমার বিচার চলে সেই অবসর সীমাহীন
যখন প্রেমের কল্পনাতে কাটিয়েছিলেম রাত্রিদিন

৫

মানুষ যাকে আশা দিয়ে বাঁচাবলে কথায়
কোথায় আমার বেঁচে থাকার আশা হেথায়! (অনু: বিপ্লব চক্রবর্তী)

বিশ্লেষণ (১-৫) :

আমরা আগেই বলেছি গালিব তাঁর ছোট ছোট কবিতাবলীর মধ্যে নিজের সঙ্গে কথোপথনের আঙ্গিকে জীবনসম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা ব্যক্ত করতেন। সেগুলি ভাব গাম্ভীর্যে যেমন গূড়তলচারী তেমনই বলার ভঙ্গিমায় সরস। নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার ছলে যেন তিনি জীবন সম্পর্কে নিজের বোধকেই প্রকাশ করতেন। উর্দূ শের্ মূলত প্রেম বিষয়ক ভাবকল্পকে ঘিরে গড়ে উঠত। গালিব তার মধ্যে দার্শনিক ভাবনা, গভীর মিষ্টিক উপলব্ধিকে অনুষ্যুত করে দিয়েছিলেন। প্রথম কবিতাটিতে আমরা দেখি, প্রেম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব একরকম ভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। নিজেকেই বোঝাচ্ছেন যে, প্রেম এমনই ভাবাত্মক বিষয় যে সবসময় তা জোর করে পরিস্ফুট করা যায় না। প্রেমের ভাবও জোর করে জাগিয়ে তোলা যায় না। অন্যদিকে প্রেমের সসিক্ত মানব - মানবীয় সম্মিলনও কোন বাধার সামনে পড়লে হারিয়ে যায় না। প্রেমভাবকে যদি আগুনের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে বলা যাবে সেই প্রেমভাবের আগুন দুটি সত্তার কার্যকারণ নিরপেক্ষ আকর্ষণ যা জ্বলে ওঠে সত্তার অন্তর্লীন চৈতণ্য থেকে। কিন্তু সেই আগুনকে জোর খাটিয়ে নেভানোর চেষ্টাও বৃথা। মানবজীবনের অনন্ত বিস্ময় এই প্রেমকে গালিব এখানে বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ নিরপেক্ষ আত্মিক টান অথবা উজ্জীবন হিসেবে তুলে ধরতে চান তাঁর কবিতায়। দ্বিতীয়টির মধ্যে যেমন প্রেমিকের আর্তি স্পন্দিত হয়েছে অন্যতর ভঙ্গিমায়। প্রেমের প্রত্যখ্যানকেই সেখানে গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রেমিকের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কাছে প্রেমের আততি যেমন সত্য তেমনই সেই প্রেমের ব্যর্থতা বা প্রত্যাক্ষ্যান। প্রেমিকের আত্মসত্তায় সেই প্রাধ্যানের ইতিহাসও লিখিত থাকে গৌরবময় হয়ে ওঠে।

মূলকবিতার বাংলা রূপান্তর (৬ - ১০)

৬

সংসারে নিষ্ঠার দাম নেই, তারপরে নেই সান্ত্বনা,
অর্থহীন বোকার কথায় কেন বাড়াও যন্ত্রণা।

৭

গালিবের কানে গানে আছে নিজের বিশেষ ভঙ্গি
রসিক জন হলে হবে সেই ভঙ্গির সঙ্গী

৮

যদি চাও দুঃখ দিয়ে বিচার করে শাস্তি দিও
পাপী হতে পারি তবু অবিশ্বাসী নই কোনোদিনও।

৯

হে আল্লাহ, বিজন বনে ফুরায় এমন
বাসনা ছিল না কোনো কালে
মৃত্যুর পরে দেখো আমার অন্তর
পরে আছে কবরের তলে।

১০

নিভে যাওয়া শিখা হে হৃদয় দুখরাগিনী যত হল মূল্যহীন
হবে না কোনো কাজ শুধু স্তব্ধ হবে জীবনবীণা একদিন

বিশ্লেষণ (৬ - ১০) :

গালিবের রচনার মধ্যে এক দার্শনিক উপলব্ধি অন্তর্লীন হয়ে থাকে সর্বদাই। সংসারের মধ্যে হয়েও তিনি যেন বাইরে থেকে সেই সংসারকে দেখতে পান। জীবনের বিষাদময়তা তাঁর সংসার জীবনে যেমন বিছিয়ে ছিল মৃত্যু পর্যন্ত তেমনই তা নানা সময়ে কবিতার মধ্যে জায়গা করে নিত। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজের কোনো মূল্য এ সংসারে নেই - তাই গালিব বলেন, পারি-পার্শ্বিকের কথায় বেশি কান দিয়ে নিজের জীবনের যন্ত্রণা বাড়িয়ে কী লাভ। তার থেকে বরং অনেক ভাল আত্মগতভাবে নিজের কাজ করে যাওয়া। যেমনটি তিনি করেছিলেন। গালিব

নিজের সঙ্গে কথা বলতেন সেই অন্তর্গতভাবে নিজের কাজ করে যাওয়া। যেমনটি তিনি করেছিলেন। গালিব নিজেদের সঙ্গে কথা বলতেন সেই অন্তর্গত সুরেই - তাঁর বিশ্বাস ছিল সমকাল তাঁকে বুঝতে পারে নি, ভাবীকাল বুঝবে। নিজের ভঙ্গিটিই তাঁর গানের শক্তি; ভঙ্গিটি ধরতে পারেন তিনি যিনি জীবনরসের রসিক। তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় ছিল বিশ্বাস; জীবনের মূলধন। এই অমূল্য বিশ্বাসকে সঙ্গোপনে রক্ষা করে চলতেন তিনি। তাইও আল্লাহ্-র সঙ্গে কথালাপে অনুযোগের সুরে বলেন, হয়ত জীবনের পথে কোনো ভুল হলে বা পাপ করলে আল্লাহ তাঁকে বিচার করে দুঃখ দিতে পারেন - কিন্তু আন্তরিকভাবে তিনি সৎ, অবিশ্বাসী কখনোই নন। একদিন সকলেই তা বুঝবে। ভাবীকালের প্রতি এই বিশ্বাস রেখেই তো একজন মহৎ কবি বেঁচে থাকেন, কবিতা লিখে চলেন। বিজন বনের একলা পথিকের মত তিনি পথ হেঁটেছেন, কখনো তিনি একলা ফুরিয়ে যেতে চান নি - তবু তাই তো হল। মৃত্যুর পরবর্তীতেও তাঁর যেন তাঁর অন্তর পড়ে থাকবে সকলের অলক্ষ্যে কবরের তলে।

গালিবের কবিতা জুড়ে থাকে এক বিষাদ। বিষন্নতাবোধের মায়া বিস্তারের মধ্যে দিয়েই তাঁর কবিতা পাঠকের কাছে আকর্ষক হয়ে ওঠে। সমস্ত জীবনের যত দুঃখ, অভিমান তা যেন জীবনের শিখায় মতই একদিন নিভে যায়, মূল্যহীন হয়ে যায়। আসলে গালিবের জীবনের প্রতি অনন্ত ভালবাসাই প্রকাশিত হয়ে ওঠে এই বিষন্নতার মধ্যে। জীবনের বীণা বাজাতে বাজাতেই তিনি যেন মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারেন। তাই মৃত্যু পরবর্তি জীবনের গানকেও তিনি সুরমূর্ছনায় করুণ করে তুলেতে পারেন। তাঁর কবিতার অন্যতম সম্পদ এই কারুণ্যের অপরূপ সুর। একদিকে জীবনের প্রতি দার্শনিক উপলব্ধি অন্যদিকে সেই জীবনের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা - দুটিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে গালিবের কবিমানসে।

মূল কবিতাবলী বাংলায় (১১-১৬)

১১

স্বর্গ যে কোথাও নেই সেই কথাটা আমি জানি
দিলটা তবু খুশ হবে শুধু গালিব কল্পনাটা মানি

১২

মোর ঘন ঘোর নৈরাশ্যের মাঝে কালের গতিস্তব্ধ হল
কালো যখন ঘনায় তখন বলো সন্ধ্যা না প্রভাত হল?

১৩

হর কদম এগিয়ে চলি ওই সুদূর মঞ্জিল ডাকো তুমি

হারিয়ে ফেলি খুঁজি চলি জনশূন্য পথ মরুভূমি।

১৪

বারেবারে আমি দেখেছি শুনেছি কিছু ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা
মদ আর পাত্র না হলে জানি যে আর জমে না জমে না।

১৫

কসম খেয়েছ মদ খাবে না আর
নেই ভরসা গালিব তবু ওপর তোমার।

১৬

হায় জীবন ! হয় জীবন ! অন্ত হবি যে তাই
বিজলী আলোয় তাই তো হৃদয় ভরে চাই। (অনু: বিপ্লব চক্রবর্তী)

টিপ্পনী

বিশ্লেষণ (১১ - ১৬) :

গালিবের ঈশ্বর বিশ্বাস তার জীবন বিশ্বাসেরই নামান্তর। তাঁর প্রেমভাবনার মধ্যে প্রসারিত হয়ে আছে তাঁর ঈশ্বরভাবনা। স্বর্গ যে কোথাও নেই গালিব একথাটা তিনি ভালমতই জানেন কিন্তু হৃদয়কে খুশি রাখার জন্যই তাঁকে স্বর্গের অস্তিত্ব মানতে হয়। একটি শেরের কথা এখানে মনে পড়ে, সেখানে গালিব ফরিশ্‌তাদের ওপর জীবনের হিসাব রাখার ভার দিয়ে উপরে খোদার বসে থাকাটাকে অভিমানের সুরে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন ; ''ফরিশ্‌তাদের লেখার উপর ভর করে আমাকে অন্যায়ভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছে শাস্তি দেবার জন্য, / লিখবার সময়ে আমার পক্ষের লোক কি কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল ?'' অনেক সময়ই গালিবের খোদার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ মান-অভিমানের স্তরে প্রকাশমান হয়েছে শেরগুলিতে। আগেই বলা হয়েছে, গালিব ইসলামী উলেমা, কট্টর ধর্মচারীদের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন না। প্রায়শই তাঁর কাছে খোদা বা ঈশ্বরের সম্পর্ক ভক্ত ও প্রেমিকের মত। প্রেম সম্পর্ক ধরে ঈশ্বরের কাছে পৌছানোর এই পথ কিছু অর্থে রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। গালিবের কবিতায় তাঁর ব্যাক্তিক জীবনে সুখ - দুঃখ ভাগ্যের উত্থান - পতনের অভিঘাত খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষত তাঁর স্বকথিত কথোপকথোনের যে আঙ্গিক শেরগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে তা কিন্তু তাঁর নিজস্ব জীবনপলব্ধির কাব্যিক প্রকাশ মাত্র। এখানে দেখা যাবে, মনের গহন নৈরাশ্যের মাঝখানে তাঁর কাছে যেন কালের গতিই স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি বলেছেন, অন্ধকারের এই অমানিশা তো প্রভাত ও রাত্রি উভয়ের দ্যোতক ! কোনটাকে ধরা হবে তাহলে ? এক সুদূর মঞ্জিল বা লক্ষ্যকে সামনে রেখে চলতে চলতে তাঁর মনে হয়, যেন জনশূন্য পথে চলেছেন তিনি,

চারিদিক বনভূমি - পথ যেন হারিয়ে গেছে। জীবন তাঁর কাছে উত্থান - পতনে ঘেরা অনিশ্চিত। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময়ের ভারতবর্ষে গলিব এমন একটা জীবন কাটিয়েছিলেন। আত্মাভিমানী একটা মানুষ, সৌন্দর্যপ্রিয় একজন কবি নিজস্ব ভঙ্গিমায় নিজেরই জবানবন্দী অভিজাত রুচি আর তীক্ষ্ণ ও নান্দনিক হয়ে উঠেছিল গালিবের মধ্যে। নৈতিকতার স্খলন এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় ওঠে নি। মদ্যপান ছাড়া নিয়ে নিজেকেই ব্যাঙ্গ করে বলেছেন, "সে ভরসা গালিব নিজেকে কী করে দেবে? জীবনকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত উপভোগ করতে চান - তাই বিজলীন আলোর রোশনাইতে তার পেয়েলায় চুমুক দিয়ে চলেন।" তাঁর শেরে সমাজমুখীনতার ভাব খুব একটা ছিল না, যা তার সিপাহী বিদ্রোহকালীন চিঠিপত্রগুলিতে পাওয়া যায়, বরং ঈশ্বরের সঙ্গে কৌতুক, নিষ্ঠুরতা ও খামখেয়ালীপনা মিশ্রিত এক ধরনের ঔদাসীন্য তাঁর শেরগুলির মধ্যে উঁকি দেয়।

টিপ্পনী

মূল কবিতাবলীর বাংলা অনুবাদ (১৭-২০)

১৭

চোখের আলোয় গালিব দেখো অন্তহীন মৃত্যুপথ
নিয়মবিহীন জগৎসভায় একটিমাত্র শৃঙ্খলার রথ।

১৮

কীসের গুণে শ্রেষ্ঠ হ'লে কত পেলে জ্ঞানীর মান
মিছাই গালিব, শত্রু হল কত আসমান সমান।

১৯

প্রেমে মজে গিয়ে গালিব নিষ্কর্মা হ'ল
নইলে কাজের ছিল কে আর বল!

২০

অমৃত লাভের সুদিন আছে কি না আছে
জীবন ভরে বিশ্বাস রাখি - ভুলে যদি পাই পাছে।

বিশ্লেষণ (১৭-২০)

গালিবের শের গুলির সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবু সয়ীদ আয়ুব বলেছেনঃ "গালিবের শের-এ দেখি বিশ্বস্রষ্ঠা আত্মদর্শনপ্রিয়, তাই চক্ষুষ্মান জ্ঞানবান মানুষকে সৃষ্টি করলেন নিজের বিশ্বময় রূপ দেখাবার জন্য। এ-দেখা নির্লিপ্ত দেখা। কিন্তু

ভগবান আরও কিছু চান, তিনি চান তাঁর এই বিশ্বরূপী শিল্পবস্তুটির গুণগ্রহণ,রসাস্বাদন”। গালিবের শেরগুলিতে ভগবানের এই শিল্পবস্তুটির রসাস্বাদনের ইশারা পাওয়া যায়। আমরা আগেই বলেছি গালিবের ঈশ্বর প্রেম হাফিজের মতই মানবপ্রেমের সংলগ্ন। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের যে সম্পর্ক তাতে গালিবের ক্ষেত্রে এসে পড়ে অভিমানের সুর। ঈশ্বর তাকে অপমান করলে দ্বিগুন ব্যঙ্গে তিনি ফিরিয়ে দেন সেই অপমান। আবু সয়ীদ আয়ূব গালিবের শের আলোচনা প্রসঙ্গে ভলতেয়ারের সেই বন্ধুকে লেখা পত্রটির কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ভলতেয়ার বলছেনঃ “I get hundred pikethrusts, I return two hundred and I laugh” তেমনি প্রত্যাঘাতের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত গালিবের একটি আশ্চর্য সার্থক ও সরল শেরঃ “আমি কী এমন জ্ঞানী ছিলাম, কোনগুণেই-বা সেরা ছিলাম,/ অকারণে আসাদ, আসমান আমার শত্রু হ'ল”।এখানের শেরটিতেও গালিবের সেই আন্তরিক অভিমান ও বিস্ময় প্রকাশিত হয়েছে।

টিপ্পনী

কোনো কোনো সময় জীবনকে গালিব দেখেছেন অন্তহীন মৃত্যুর পথ হিসেবে। এই মৃত্যুর নিয়তি অথবা ভবিতব্যতা কেউ এড়িয়ে যেতে পারেন না। জীবনে সমস্ত নিয়মের স্খলনের মধ্যে দাঁড়িয়েও একমাত্র এই মৃত্যুর শৃঙ্খলায় সবাই বাঁধা আছে। গালিব বলছেন তাই, 'নিয়মবিহীন জগৎসভায়'একি একটি শৃঙ্খলার রথের যাত্রী হয়েই তাঁকেও চলে যেতে হবে একদিন। এই জীবনকে ভালোবাসেন গালিব; তাই মৃত্যুর ওপারে অমৃত আছে কিনা তার নিশ্চয়তা পান নি বলেই জীবনভর বিশ্বাসকে অটুট রাখার কথা বলেছেন। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে বুঝিয়েছেন, ভুলে যেও না গালিব নিজের প্রতি বিশ্বাসই শেষ কথা, সেখানেই অমৃতের আস্বাদ। এখানে গালিবকে খুব বাস্তববোধ সম্পন্ন এক জীবনপ্রেমিক কবি হিসেবে মনে হয়। আমরা যদি বিধাতাপুরুষের নেপথ্যে কোনো অস্তিত্বকে মানি তাহলে মুক্তবুদ্ধিতে যেটা স্পষ্ট হয় তা হ'ল, ব্যক্তিমানুষকে সুখী করা বা সুখে রাখাই বিধাতাপুরুষের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। গালিব তো জীবনের প্রেমিক, তাই লোকের নিষ্কর্মা বলে বলে হয়। তদগতচিত্তে ঈশ্বরসাধনা তাঁর পথ নয়, বরং জগৎ-প্রেমিক হিসেবে, নারী প্রেমিক হিসেবেই তাঁর খোদাকে 'শুভবুদ্ধ'কে স্পর্শ করার প্রচেষ্টা থাকে। এই প্রণয়ের কথোপকথনে গুরুগম্ভীর ভাবের সঙ্গে লঘুচালের সংমিশ্রন তাঁর শেরগুলিকে তীক্ষ্ণ করে তোলে।

২.২. নবকান্ত বড়ুয়ার কবিতা :

নবকান্ত বড়ুয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী :

নবকান্ত বড়ুয়া বিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম প্রখ্যাত অসমীয়া কবি ও ঔপন্যাসিক।

১৯২৬ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর আসামের গৌহাটিতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক নীলকান্ত বড়ুয়া এবং মাতা স্বর্ণলতা বড়ুয়ানি। তার তিন ভ্রাতা দেবকান্ত, জীবকান্ত ও শিবকান্ত। অগ্রজ ভ্রাতা দেবকান্ত ছিলেন ইমারজেন্সি'র সময়ে (১৯৭৫ - ৭৭) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। পরবর্তিতে বিহারে গর্ভনর নিযুক্ত হন। দেবকান্ত বড়ুয়া নিজেও বিশিষ্ট কবি 'সাগর দেখিছ' তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

নবকান্ত বড়ুয়ার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বাড়ির কাছের স্কুলে ; পরবর্তিতে ভর্তি হয়েছিলেন সরকাই মজলিয়া বিদ্যালয়ে। ১৯৩৩ সালে নওগাঁতে সরকারি বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হনন নবকান্ত। ১৯৪১ সালে এখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন তিনি। এরপর গৌহাটি কটন কলেজে ভর্তি হলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর দু'বছর নষ্ট হয়। ১৯৪৩ সালে তিনি শান্তিনিকেতন আসেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ইংরাজি সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে অনার্সসহ স্নাতক হ'ন এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে স্নাতকোত্তর পাশ করেন।

উত্তর প্রদেশের শিকহবাদ এ কে কলেজে শিক্ষক হিসেবে নবকান্ত বড়ূয়ার চাকরি জীবনের সুত্রপাত ঘটলেও সেই বছরই ঝোড়হাটে জগন্নাথ বোরা কলেজের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন; সেখানে তিনি ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত চাকুরিরত ছিলেন। ১৯৬৪ - ৬৭ সাল পর্যন্ত আসামের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ এ ইংরাজি শিক্ষার অধিকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি পুনরায় কটন কলেজে ফিরে আসেন এবং কটন কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে চাকুরি থেকে অবসর নেন ১৯৮৪ সালে। নবকান্ত বড়ুয়া 'অসম সাহিত্যসভা'র সভাপতি ছিলেন ১৯৬৮ সালে। ১৯৭৫ সালে তিনি অসমীয়া লেখক হিসেবে সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার ও ১৯৭৬ সালে পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি লাভ করেন 'অসম ভ্যালি লিটারেরি এওয়ার্ড - এছাড়া সোভিয়েট ল্যান্ড পুরস্কার, কবীর সম্মান ইত্যাদি বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। ২০০০ সালের ১৪ জুলাই নবকান্ত বড়ুয়ার জীবনাবসান ঘটে।

নবকান্ত বড়ুয়ার রচনা :

নবকান্ত বড়ুয়া আধুনিক অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যের একজন অন্যতম লেখক। তাঁর সর্বমোট গ্রন্থসংখ্যা ৩৯ টি। এর মধ্যে ১ টি কাব্যসঙ্কলন, ৫টি উপন্যাস, ৮টি শিশুপাঠ্যগ্রন্থ ও চারটি নাটক রয়েছে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ ও উপন্যাসগুলির কয়েকটি এরকম -

হে অরণ্য হে মহানগর (কাব্যগ্রন্থ), মুর আরু পৃথিবীর (কাব্যগ্রন্থ), হেটি দুটি এগ্রটি তোরা (কাব্যগ্রন্থ), সম্রাট (কাব্যগ্রন্থ), রাতি ঝিলমিল তোরা ঝিলমি (কাব্যগ্রন্থ), রত্নাকর আরু অন্যান্য কবিতা (কাব্যগ্রন্থ), কাকাদেউতার হার (১৯৭৩, উপন্যাস), মানহু আতাইবর দ্বীপ

টিপ্পনী

(১৯৮০, উপন্যাস), অ-পদার্থ (১৯৮১, উপন্যাস), কপিলপরিয়া সাধু (১৯৫৩, উপন্যাস), এছাড়া, বেশ কিছু শিশুদের সুখপাঠ্য গল্প কবিতার সংকলন যেমন 'গোলাপ আরু বেলিফুল', 'কিশোর রামায়ন', 'কিশোর উপনিষদ', 'মাখনর কুকুরাপাওয়ালি' ইত্যাদি তাঁর নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত কয়েকটি বহুল পঠিত কবিতা হল, 'পলখ', 'মনত পড়ে অরুন্ধতি', 'নরকত ডন জুয়ান, ক্রোশত ডন জুয়ান, ইত্যাদি। বিভিন্ন ভাষায় নবকান্ত বড়ুয়ার কাব্য ও উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। নবকান্ত বড়ুয়া, অমূল্য বড়ূয়া ও হেম বড়ূয়াকে অসমীয়া কবিতার সূচনাপর্বের লেখক বলা যায়। মূলত তাঁদের হাত ধরেই অসমীয়া কবিতায় নবযুগের আধুনিকতার সূত্রপাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে অসমীয়া কাব্যধারাটির নতুন প্রতিক্রীয়ায় গতিপথ তাঁদের লেখাই নির্মাণ করে দিয়েছিল। নবকান্ত আত্ম সচেতন কবি ছিলেন। কালচেতনা ও সমাজবোধে পরিশীলিত তাঁর কবিমানস। তাঁর নিঃসঙ্গতা বহির্জগতের গুঞ্জণধ্বণিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আধুনিক যুগে প্রাচীন মূল্যবোধের অনুপস্থিতি, হৃদয়চর্চার ভাব তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। প্রাচীন প্রজঙা হারিয়ে যাওয়ার ফলে আধুনিক মন সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এই সংঙ্কীর্ণতা দূর করার জন্য কবির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে মুক্ত আকাশ। তাঁর কবিতায় রাবীন্দ্রিক প্রতিধ্বনি নেই বরং এলিয়টীয় প্রকাশভঙ্গি তাঁর কাব্যকে আধুনিকতার মোড়ক দিয়েছে। কিন্তু স্বকীয়তায় সেসব কবিতা উজ্জ্বল। অধিকাংশ কবিতাই চিত্রধর্মী ও গদ্যছন্দ স্পন্দিত। মানবচৈতন্য তাঁর কবিতার অন্যতমবড় বিষয় হওয়াতে কোনো কোনো সময় তা যেমন পরাবাস্তবতার দিকে ঝুঁকেছে তেমনই ফারসী প্রতীকবাদীদের সংলগ্ন ও তাঁকে মনে হতে পারে।

আধুনিক অসমীয় কবিতা ও নবকান্ত বড়ুয়া :

বিশ শতকের প্রথম ভাগে অসমীয়া কবিতার আঙিনায় ইংরাজি কাব্যের যে ঢেউ লেগেছিল তার মাধ্যমে পালাবদল ঘটেছিল। ফারসী, রুশ, চীনা ও জাপানী কাব্যও এই সময়ের আধুনিক কবিরা পাঠ করেছেন, তারও প্রভাব এসেছে তাদের কাব্যে। নবযুগের অসমীয়া কবিতায় ব্যোদলেয়ার, মালার্মে, পোল ভ্যালেরি, রিলকে ছায়াপাত তাই কোনো নতুন কথা নয়। বরং বাংলা আধুনিক কবিতার মতই সে কাব্যে আধুনিকতা এসেছে পুরানোকে ভেঙে, নতুনের নির্মম বাস্তব কশাঘাতের মধ্য দিয়ে। আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠা, উরাণের নবায়ন, পরিচিত মিথের ভাঙন যেমন কবিতার আধুনিক হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট, তেমনই অসমীয়া কবিতায় ঘটেএ। হেমকান্ত বড়ুয়ার কাব্যের মধ্যে সেই সুর ও ভাঙ্গা-গড়ার দেখা মেলে। নৈতিক অবনমন, গতির সঞ্চার, পরিবর্তন জগত - সংসার, সর্বোপরি ভূগোলের বিস্তার আধুনিক কবিতার চিত্রকল্পে আনে অবিস্মরণীয় সজীবতা। পরিচিত ইতিহাস, মিথ্ হয়ে ওঠে সমকালীন বাস্তবতার রঙে বহু

অর্থবোধক।

আগেই বলা হয়েছে নবযুগের কবিদের মধ্যে নবকান্ত বড়ুয়ার কবিতায় টি এস এলিয়টের প্রভাব অন্যান্যদের থেকে অনেক বেশি। এলিয়টীয় কাব্যভাষার জটিলতা নবকান্তের কবিতার মধ্যেও মাঝে মধ্যেই দূরুহতার জন্ম দিয়েছে। উচ্চশিক্ষিত, আধনিক কবিদের মতই তাঁর কবিতাও পাঠকের ন্যূনতম পাঠরুচি প্রত্যাশা করে। নবকান্ত বড়ুয়ার কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে আসা, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী সাহচর্য তাঁর কবিতার ভাষাকে প্রভাবিত করেছিল। কাব্য আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষার সাহস ও প্রবৃত্তির মূলে এইসব বাঙালি কবিদের কাব্যপাঠের ছায়াপাত লক্ষ্যনীয়। বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া বলেছেন : "তিনি ছন্দ গঠনে, মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর দুয়েরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং উভয় ধারাতেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এলিয়টের মতই তিনি বর্তমান যুগের একঘেয়েমি, দ্বিধাবিভক্তি, আন্তরিকতা ও অতিরিক্ত আত্মসচেতনতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং মধ্যবিত্তদের তথাকথিত নাকউঁচু ন্যাকামি' সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু তার জন্য তিনি কখনোই তিক্ত নন। জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে গ্রহণ করে তার রসোদঘাটনই তাঁর কাব্যের মৌলিক সুর।" (অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস)

মূল কবিতা :

কার্ফুর সময় হল।
সূর্যস্নাত নগরীর আঁচলের শেষ রশ্মিকণা
শুষে নিল রাতের আকাশে;
নিস্তব্ধ মরণ নামে। নগরীর ধমনীতে কারো অনুভব
কাজিরাঙা ডবকার আরণ্যক অপস্মার
সরীসৃপ - ক্রুর মৃত্যু .... সর্পিল জীবন;
পলাতক দৈনন্দিন নিয়ন উজ্জ্বল গোধূলির
রাঙা নীল বিবর্ণ মুখ
হেনা মধুমালা আর অলকানন্দার ....

* * * *

পথ আর উপপথের গলি আর এভিনিউ
বোবা যন্ত্রনায় অন্ধকার

টিপ্পনী

পিছল মৃত্যুর শাপ পায়ের তলা দিয়ে যায়
(প্রহর কত কত)
কণ্ঠরোধী ট্রাফিকের দূরের স্পন্দনে
ভয় আর আশ্বাসের জটিল উৎকণ্ঠা আনে;
(অরণ্যে চোখ জ্বলে বাঘ আর বন বিড়ালের)

জীবন বেঁচে থাকে। তথাপি বেঁচেই থাকে।
আর থাকে জীবিকার গলির ধাঁধাঁ
অমৃতের পুত্র আমি
মৃত্যু - স্নাতা হে মহানগর! (অনু: বিপ্লব চক্রবর্তী)

টিপ্পনী

কাব্যটির পরিচয় ও বিশ্লেষণ :

নবকান্ত বড়ুয়ার একটি অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'হে অরণ্য হে মহানগর'। এই কাব্যগ্রন্থের শিরোনামাঙ্কিত কবিতা এটি। কাব্যগ্রন্থটি ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধ - সমকালীবন পটভূমি কীভাবে কবিমানসে নতুন অভিঘাত তৈরি করেছিল তার পরিচয় এই কাব্যে পাওয়া যায়।

নবকান্ত বড়ুয়ার প্রথম পর্যায়ের কবিতায় নগর চেতনা উজ্জ্বল ছিল। তিনি ছিলেন আত্ম-সচেতন কবি। তাঁর কাব্যচৈতন্যের সঙ্গে জীবনযাত্রায় অঙ্গাঙ্গীযোগ। একদিকে পুঁজিবাদী সমাজসভ্যতার অবক্ষয় অন্যদিকে প্রাণগঙ্গার নীরবতা - এই যন্ত্রণা নিয়েই তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্যায় কেটেছে। নাগরিক জীবনের মধ্যেও যেন রয়ে গেছে আরণ্যক ভীতি, আবার তা সত্ত্বেও জীবনের আশ্বাস আছে। এই নাগরিক মহাশ্মশানে মানুষ বেঁচে থাকবে কী করে ? নবকান্তর কবিতার মধ্যে সেই জীবনের বাস্তবতা থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রয়োজন আধ্যাত্মিক - মূল সুর যেনে সেখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে। রুদ্ধশ্বাস জীবনের বাস্তবতা থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রয়োজন আধ্যাত্মিক প্রশান্তি। কিন্তু নবকান্তর এই আধ্যাত্মিকতা ধর্ম ও ঈশ্বরের সংকীর্ণতা দিয়ে বাঁধা নয়, বরং রবীন্দ্রনাথ যে সহজাত শুভবুদ্ধির কথা শুনিয়েছিলেন তার অনুসরণ যেন সেখানে শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত 'সোরস্বপ্না', 'পলায়ন', 'বোধিদ্রুমর খরি' ইত্যাদি কবিতায় সেই সুর শোনা যায়। পাঠ্য কবিতাটির মধ্যেও আমরা নাগরিক জীবনের এমন বিশ্লেষণ খুঁজে পাই।

এই কবিতায় আমরা পাই নাগরিক ধ্বস্ততার চলচ্ছবি। আমরা জানি, এলিয়টের

কবিতার মধ্যেও নাগরিকতার মধ্যে দিয়ে আধুনিকতা এসেছিল। সেই আধুনিকতার অন্যতম চারিত্র ছিল একঘেয়ে পৌণঃপুনিক জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি; কোনো কোনো সময় সেই নাগরিকতার বিবর্ণ ছবিই কবিতায় ধরা দিয়েছিল অনন্য চিত্রকল্পের মধ্যে। নবকান্ত বড়ুয়া অসমীয়া কবিতার আধুনিক যুগের কবি, নতুন শতাব্দীর নতুন সময়ের কবি। দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ক্রমশই বদলে যাচ্ছে সময়, ক্ষীণ হয়ে আসছে এতাবৎ কাল চলে আসা অপ্রমেয় জীবনের আশাবাদী চৈতণ্য, তখনই নবকান্ত তাঁর কবিতায় শুনিয়েছেন নতুন সুর। সেই সুর একদিকে যেমন নাগরিক তেমনই ছেঁড়া ভাঙা - চোরা জীবনের মলিনতাকে সে ফুটিয়ে তোলে কবিতার পরতে পরতে। দৈনন্দিন পরিচিতির মধ্যে থেকে উঠে এসে নতুন সত্তার প্রশ্নাতুর মান। নাগরিক অন্ধকারাচ্ছন্নতা যেন মননের অন্তরের প্রবেশ করে অর্থহীন করে দেয় জীবনের সকল সত্য। তাহলে কীভাবে জীবন? এই অমানিশ থেকে কী মুক্তি নেই মানুষের? প্রশ্ন ঘুরপাক খায় কবির মাথার ভিতর। আশ্বাস ও উৎকণ্ঠার জটিল বেড়াজালে ঘিরে থাকা এক নাগরিক কবির চেতনায় তখন জেগে ওঠে আদিম অরণ্যের উত্তরাধিকার।

কবিতার শুরুতে দেখা যায় মহানগরে এক কার্ফুর সন্ধ্যেবেলার চিত্রকল্প। সূর্যাস্নাত নগরীর উপর চাদরের মত অন্ধকার নামে, সূর্যের শেষ রশ্মিকণা হারিয়ে যায় দিগন্তে। নিস্তব্ধ হয় চারপাশ; মরণের মত নিস্তব্ধতা। এই অন্ধকারের মধ্যে থেকেই বেশ টের পাওয়া যায় নগরের ধমনীতে বয়ে চলেছে আরণ্যক জীবনের স্রোত; কজাজিরাঙা দবকার আরন্যক জীবন যেন এই অন্ধকারকে করে তোলে সর্পিল ভয়ার্ত; সরীসৃপের মত হেঁটে আসে মৃত্যু, যে-কোনো সময় আক্রান্ত হতে পারে জীবন। সতত সতর্ক থাকতে হয় তাকে - ভয়ার্ত নাগরিক রাত্রির বুকে দাঁড়িয়ে। প্রতিদিনের নিয়ন বাতি নিভে গেছে, উজ্জ্বল গোধূলি হারিয়ে গেছে গভীর অন্ধকারে। হেনা মধুমালা, অলকনন্দার মত রাঙা নীল বিবর্ণ মুখব্যাদান - একটি নগর যেন থমকে আছে।

নগরের পথ যেমন নিশ্চুপ তেমনই বিবর্ণ আজ গলিগুলি এবং বড় এভিনিউ সড়ক। বোবা যন্ত্রণায় যেন গুমরাচ্ছে তারা; কত কথা তাদের অথচ বাধ্যতাই তারা নিশ্চুপ। এই নৈঃশব্দের অন্ধকারে কেটে যায় প্রহরের পর প্রহর। সাপের মত মৃত্যু যেন ঘিরে থাকে এই নাগরিক নৈঃশব্দকে। কণ্ঠরোধী ট্রাফিকের স্পন্দন যেন থেকে আছে রাত্রির এই ভয়ার্ত অন্ধকারে। মাঝেমধ্যে দু' একটা আলো যেন মনে হয় অরণ্যের মধ্যে জ্বলতে থাকে বাঘের চোখ অথবা বন বিড়াল। চেতনার গভীরতম স্তরে এই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে যেন, নিরর্থক করে দেয় জীবন হয়ত। জীবিকার দুঃসহ পৌনঃপুনিকতা থাকে না - যেন এক প্রহেলিকাময় ধাঁধাঁর মত। একই গলি দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নিত্য যাতাযাত সেই ভয়ঙ্কর বাস্তব; যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় নিরন্তর। শারীরিক সে বেঁচে থাকায় মন নেই। যেন প্রতি মুহূর্তে মনে হয় জীবন হেরে গেছে এখানে। তবু কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে, আরণ্যক মানুষ। তার চেতনার গভীর প্রদেশে

অন্ধকারের মধ্যেই শোনা যায় জীবনের গান। অজস্র মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়েও এই গভীর অন্ধকারে কবি জেগে থাকেন। জীবন যেমন বেঁচে থাকে, চলমান মৃত্যুর স্রোতের ভিতর। অমৃতের পুত্র মানুষ। তাই তো কবির বেঁচে থাকা।

কবিতাটির মধ্যে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলিই এই কবিতার আধুনিকতার চিহ্নায়ক। ছন্দহীনতার আপাত চলন আসলে গদ্যছন্দের অনাবলি প্রবাহকে স্পষ্ট করে। মহানগরকেই কবি ফুটিয়ে তোলেন ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি দিয়ে, কার্ফুর রাত্রির ভয়াবহ অনুষঙ্গে। একদিকে আরনণ্যক চেতনা অন্যদিকে দুরারোগ্য ব্যাধির মত যেন রাত্রি নেমে এসেছে মৃত্যুর অনুষঙ্গ নিয়ে। কবি বলেছেন 'মৃত্যু - স্নাতা মহানগর'। এই মৃত্যুতে উপলব্ধি করা যায় নাগরিক রাত্রির অন্ধকারে। আবার কবি সেই মহানগরকে 'হে' বলে সম্বোধন করেছেন। যেন কোনো জীবনপ্রেমিক ভক্ত রাত্রির অন্ধকারে। আবার কবি সেই মহানগরকে 'হে' বলে সম্বোধন করেছেন। যেন জীবনপ্রেমিক ভক্ত রাত্রির মধ্যেই জীবনের আবাহন ঘটাচ্ছেন - কোনো কার্ফু যেন এই জীবনকে কেড়ে নিতে বা থামিয়ে দিতে পারে না।

টিপ্পনী

গ্রন্থঋণ :

১. বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্য (১৯৬৭), সম্পাঃ হোমেন বরগোহাঞ্চি, অসম সাহিত্য সভা

২. অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস, বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, সাহিত্য অকাদেমী

৩. আধুনিক ভারতীয় কবিতা সংগ্রহ (১ম ও ২য়), ২০১০, সম্পাঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, কলকাতা

৪. গালিবের গজল থেকে, আবুসয়ীদ আইয়ুব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫. হিস্ট্রি অব ইন্ডীয়ান লিটারেচার, সম্পাঃ শিশির কুমার দাস, সাহিত্য অকাদেমী

২.৩. মহাদেবী বর্মার কবিতা

মহাদেবী বর্মা সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

১৯০৭ সালের ২৬ শে মার্চ উত্তরপ্রদেশের ফরুকাবাদে জন্মগ্রহণ করেন মহাদেবী বর্মা ।তাঁর পরিবারটি ছিল কায়স্থ ব্রাহ্মণ, পেশায় বভবহরজীবী। মহাদেবী বর্মার পিতা ছিলেন গোবিন্দপ্রসাদ বর্মা ও মাতা হেমরাণী; মহাদেবী ছিলেন তাঁদের জ্যেষ্ঠ কণ্যা। জগমোহন ও মনমোহন নামে তাঁর দুই ভ্রাতা ও শ্যামা নামোও এক বোন ছিল মহাদেবী বর্মার। ইন্দোরের মিশন স্কুলে মহাদেবীর শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত ঘটে। শৈশবে শিক্ষার জন্য তাঁর অভিভাবকরা বাড়িতে এক পন্ডিত, এক মৌলবী ও একজন সংগীত শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। মহাদেবী বর্মা তাঁর "মেরে বাচপন্ কে দিন" গ্রন্থে ছোটবেলার জীবন সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতার কথা

বলেছেন। তাঁর মা খুব ভাল সংস্কৃত জানতেন এবং পিতৃব্যের ইচ্ছে ছিল মহাদেবী একদিন বড় পন্ডিত হয়ে উঠবেন। বাড়ির এই উদার পরিবেশ তাঁর শিক্ষার সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু সেসময়ের সামাজিক চল অনুযায়ী ১৯১৬ সালে সাময়িক ভাবে শিক্ষা স্থগিত রেখে বাড়ি থেকে মহাদেবীর বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ন'বছর। তাঁর স্বামী ছিলেন ড. স্বরূপ নারাইন বর্মা। কিন্তু ছোট বয়স হলেও মহাদেবী স্বামীর সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করেন এবং নিজের শিক্ষা চালিয়ে যান। এসময়ে তাঁর স্বামীও লক্ষৌতে উচ্চশিক্ষার জন্য থাকতেন ও মহাদেবী থাকতেন তাঁর অভিভাবকদের সাহচর্যে। ১৯২৯ সালে মহাদেবী বর্মা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে স্নাতক হন; পরবর্তিতে ১৯৩৩ সালে সংস্কৃতে এম এ পাশ করেন। ১৯৩০ সাল থেকে এলাহাবাদে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মহাদেবী। ; তিনি এম. এ পাশের পর প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠের প্রথম হেডমিস্ট্রেস হয়েছিলেন। হিন্দি ভাষায় নারীশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শেষ জীবনে এই প্রতিষ্ঠানের আচার্য পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন মহাদেবী বর্মা।

টিপ্পনী

কলেজে বি এ পড়াকালীন কলেজের গ্রীষ্মবকাশের ছুটিতে মহাদেবী বর্মার বৌদ্ধগুরু মহাস্থবির সঙ্গে সাক্ষাত হয় ১৯২৯ সালে। সে সময় নৈনিতালে মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্য ও প্রেরণা তাঁকে সমাজসেবায় উদ্বেজিত করে। প্রয়াগের পার্শ্ববর্তী গ্রামে শিশুশিক্ষা ও সামাজিক নানাবিধ কাজকর্মে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন তিনি। ১৯৩২ সালে 'চাঁদ' পত্রিকার অবৈতনিক সম্পাদক হয়েছিলেন তিনি। ১৯৩৩ সালে প্রায়াগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁর; পরবর্তীতে শান্তিনিকেতনে পুনরায় কবিগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন তিনি। কলকাতায় এসেছিলেন যেই বছর এবং জাপানি কবি নোগুচির স্বাগত সমারোহে অংশ নেন তিনি। ১৯৩৬ সালে নৈনিতালের রামগড়ে মীরা মন্দির নির্মণে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাঁর। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার পদযাত্রা করেন কেদার - বদ্রীতে। ১৯৪২ সালে সাহিত্যকার - সংসদ স্থাপনা কএবং বিশ্ববানী সম্পাদনা তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। ১৯৫২ সালে উত্তরপ্রদেশের বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত হন মহাষদেবী বর্মা। ১৯৮৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আশি বছর বয়সে মহাদেবী বর্মার জীবনাবসান ঘটে।

মহাদেবী বর্মা সারা জীবনে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন; যা তাঁর সমগ্রজীবনের কর্মপ্রয়াস ও সাহিত্য প্রয়াসের স্বীকৃতি। ১৯৩৩ সালে 'নীরজা কাব্যের জন্য সাক্সেরিয়া পুরস্কার ও ১৯৪৩ সালে 'স্মৃতি কী রেখাঁয়ে' গ্রন্থের জন্য দ্বিবেদী পুরস্কার লাভ করেন তিনি। ১৯৫৪ সালে তিনি কেন্দ্রীয় সাহিত্য অকাদেমীর সদস্য মনোনীত হয়। ১৯৫৬ সালে পদ্মভূষণ ও ১৯৮৩ সালে 'যামা' ও 'দীপশিখা'র জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন মহাদেবী বর্মা।

মহাদেবী বর্মার সাহিত্যকৃতি :

হিন্দি ছায়াবাদী যুগের চারজন প্রধান কবির মধ্যে মহাদেবী বর্মাকে গণ্য করা হয়ে থাকে। তিনি অসমান্য ছবি আঁকতে পারতেন; তাঁর 'যামা' গ্রন্থখানিতে এই ছবি ও অলঙ্করণের উপস্থাপন লক্ষ্ করা যায়। 'নীলকন্ঠ' তাঁর একটি বিখ্যাত রচনা যা আজও সিইএসই বোর্ডের সরকারী স্কুলশিক্ষাগ্রন্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মহাদেবী বর্মা শিশুদের জন্য অনবদ সব স্বাদু রচনা লিখে গেছেন। 'মোরে বাচপন্ কে দিন', গিল্লু ইত্যাদি তার মধ্যে বহুন পঠিত ও স্মরনীয়। নীচে তাঁর সাহিত্যকর্মের উজ্জ্বল আখরগুলির একটি নির্বাচিত তালিকা দেওয়া হল।

টিপ্পনী

কাব্যগ্রন্থ :

নীহার (১৯৩০), রশ্মি (১৯৩২), নীরজা (১৯৩৫), সান্ধ্যগীত (১৯৩৬), দীপশিখা (১৯৪২), প্রথম যাম (১৯৬২), সপ্তপর্ণা (১৯৬৬, অনুবাদ), হিমালয় (১৯৬৩), অগ্নিরেখা (১৯৯০) :

গদ্যসাহিত্য :

অতীত কে চালচিত্র (স্কেচধর্ম রচনা, ১৯৪১), শৃঙ্খলা কী কড়িয়াঁ (নারী বিষয়ক প্রবন্ধ, ১৯৪২), স্মৃতি কী রেখায়েঁ (স্কেচধর্মী রচনা, ১৯৪৩), ক্ষণদা (নিবন্ধমূলক রচনা, ১৯৫৬), সাহিত্যকার কী আস্থা তথা অন্যায প্রবন্ধ (সমালোচনামূলক রচনা, ১৯৬০), চিন্তন কে ক্ষণ (১৯৮৬) ইত্যাদি।

সংকলন :

যামা (১৯৩৬), সন্ধিনী (১৯৬৪), গীতপর্ব (১৯৭০), পরিক্রমা (১৯৭৪), স্মৃতিচিত্র (১৯৬৬)

ছায়াবাদ ও মহাদেবী বর্মা :

হিন্দি কাব্যসাহিত্যের বিশ শতকের ইতিহাসে 'ছায়াবাদ' একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কাব্যধারাকে বোঝায়। জয়শঙ্কর প্রসাদ, সুমিত্রানন্দন পন্থ, সূর্যকান্ত ত্রিপাটী (নিরালা) ও মহাদেবী বর্মাকে ছায়াবাদের বিশেষ কবি হিসেবে ধরা হয়। ছায়াবাদ কী ? এবিষয়ে নানাবিধ মতামত আছে কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যায়, ইংরাজি রোমান্টিসিজমের সন্নিকটবর্তী এই কাব্যভাবনা বৃহদর্থে কবির নিজস্ব অনুভব, অনুভূতির আশহচর্য বর্ণমালার এক রহস্যময়তা ঘেরা প্রকাশকে বোঝায়। মন্ময়তাধর্মী এই কাব্যপ্রকাশের ধারায় কবির আত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ অনেক সময়ই মিস্টিক; ভারতীয় কাব্যধারায় ছায়াবাদ এই কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের কালপর্বকে সাধারণভাবে ছায়াবাদের সময়পর্ব ধরা হয়ে থাকে । অর্থাৎ হিন্দি

কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ছায়াবাদী যুগের পূর্ববর্তী হ'ল, ভারতেন্দু (১৮৬৮ - ১৯০০) যুগ এবং পরবর্তী হল, দ্বিবেদী যুগ (১৯০০ -১৯১৮)। ১৯৩০ সালের পরেও এই ছায়াবাদী যুগের প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়। হিন্দি কাব্যে দিনকর, মহাদেবী বচ্চন প্রমুখ কবিরা যখন দৈনন্দিন সমাজ - রাজনীতিকেও কবিতার মধ্যে নিয়ে এলেন আধুনিকতার শর্ত মেনে, তখন ছায়াবাদ ক্রমশ অন্তর্হিত হয়েছে। ছায়াবাদী কাব্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল, জয়শঙ্কর প্রসাদের 'কামায়ণী' (১৯৩৬), মহাদেবী বর্মার 'নীহার' (১৯৩০), হরিবংশ রাই বচ্চনের 'মধুশালা' (১৯৩৫)। ছায়াবাদ তার সূচনা পর্বে পাঠক কর্তৃক খুব ভাল ভাবে গৃহিত হয়েছিল ; যদিও কাব্যের কায়ায় অতিরিক্ত গহনা অনেকেরই অসন্তুষ্টির কারণ। সমকাল থেকে দূরে সরে থাকার বিষয়টিও এই ছায়াবাদী আন্দোলন সম্পর্কে পাঠকদের এক সাধারণ সমালোচনা ছিল। ছায়াবাদের ভাবভূমিটি কেমন সে বিষয়ে বহুমত থাকলেও এবং সেগুলির মধ্যে বিরোধাভাস থাকলেও কয়েকটি দেখে নেওয়া যেতে পরে।

> "ছায়াবাদী কবি ধর্মীয় আধ্যাত্ম অপেক্ষা ব্রহ্মার দর্শনে অধিক প্রভাবিত। তিনি মূর্ত ও অমূর্ত পৃথিবীর সম্মিলনে পূর্ণতা প্রাপ্ত। যিনি সূক্ষ্ম মেধার জীবন অখন্ড ভাবতে পারেন, তিনি হৃদয়কে প্রকৃতির সৌন্দর্যবত্তা ও রহস্যময় অনুভূতিকে সুখে - দুঃখে সম্মিলিত করে এমন কাব্য সৃষ্টি করেন, যেখানে ছায়াবাদ, প্রকৃতিবাদ হৃদয়বাদ আধ্যাত্মবাদ রহস্যবাদ ইত্যাদি সামগ্রিকভাবে উপস্থিত।" (মহাদেবী বর্মা)

> "ছায়াবাদ আশাহীন অসফলের বেদনা অনিঃস্ব বিষাদগ্রস্থ মননের প্রতিফলনের পরিবর্তে করুণাঘন স্বান্ত্বনার সর্বাত্মক প্রকাশ"। (মহাদেবী বর্মা)

মহাদেবীর মতের পূর্ন সমর্থন করেন সুমিত্রানন্দ পন্থ। তিনি বলেনন :-

> "দ্বিমতে বলতে গেলে নবতর সামাজিক ও জীবনের বাস্তবিকতাকে কাব্যে গ্রহণের পূর্বে হিন্দি কবিতা ছায়াবাদী রূপে 'হাস যুগের নির্ব্যক্ত অনুভবসম্পন্ন, উর্ধমার্গি বিকাশ প্রবৃত্তি। ঐহ্যিক জীবনের আকাঙ্খা সম্বন্ধীয় স্বপ্ন ও নিরাশা এবং বেদনার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুব্ধতা থেকে পলায়নপরতা এবং প্রাকৃতিক দর্শনের সিদ্ধান্তে সুখ - দুঃখ আশা নিরাশার ইন্দ্রিয় সামঞ্জস্যবিধানে উন্মুখ ; সাপেক্ষ অপেক্ষা নিরপেক্ষর প্রাধান্য।"

ড. নগেন্দ্র বলেছেন :

> "স্থূলের বিরুদ্ধে সূক্ষ্মের বিদ্রোহ ছায়াবাদের আধার"। তাঁর বক্তব্য -ছায়াবাদী কবিতার ভাবভূমি প্রেরণা রহস্যানুভূতি থেকে তার জন্ম নেয়। এই ইচ্ছার

কারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অচলাবস্থা এবং সমাজে সংস্কারবাদী নৈতিকতা অসন্তোষ এবং বিদ্রোহ বহির্মুখী ভাবনার অবসরের অভাব। ফলস্বরূপ কবির অন্তর্মুখী অবস্থার মুক্তিচৈতিন্য মানসিক বিক্রিয়ার চিত্রকল্প রচনার প্রবৃত্তি। আশার স্বপ্ন এবং নিরাশার চিত্রকল্প ছায়াবাদী কবিতায় রূপান্তরিত।"

টিপ্পনী

মূল কবিতা :

সব নেভা দীপ আমি জ্বালিয়ে নেব।
ঘিরেছে আজ অন্ধকার, দীপক রাগিনী আমি জাগিয়ে যাব
ক্ষিতিজ - কারা ভেঙে ফেলে আজ
গান গেয়ে ওঠে উন্মাদ ঝড়
মেগেরা আজ না পারে রাখতে
নৃত্য বিভোর তড়িৎ বেঁধে
ধূলির এই বীণার পরে তৃণের সব তার মিলিয়ে নেব !

ভীত তারকা মোদে নয়ন
ভ্রান্ত মরুৎ পায় না পথ

ছোটে উল্কা আকাশ পথে
ধ্বংস আসে ঝড়ের বেগে
আঙুল দিয়ে আড়াল করে সব কোমল স্বপ্ন বাঁচিয়ে নেব!

সুর হ'ল মৃদু বর্তিকা
প্রতি স্বর কাঁপে যেন মনোহর দীপশিখা
ছড়িয়ে পড়ে আলোর মতো
সিক্ত মনে ঝংকার যত
এই মরণের পর্বকে আজ দীপাবলী বানিয়ে যাব।

দেশে এই কোমল ব্যাথা
অশহরুর এ সজল রথে
মেমের মত সাধগুলি সব
দিয়েছে বিছায়ে অঙ্গার পথে
বোলে না সোনা তাদের আজ ক্ষারে ঢেকে ঘুম পাড়িয়ে যাব।

আজ তরীর দাঁড় বেয়ে বেয়ে
তুমি দেখিয়ো না পার গো
আজ গর্জনের মাঝে শুধু
মেরে ডেকে নিও একবার গো
জোয়ারকে তরী করে এই প্রলয় পার হয়ে যাব!
আজ দীপক রাগে গেয়ে যাবে! (অনু: বিপ্লব চক্রবর্তী)

টিপ্পনী

কবিতার বিশ্লেষণ :

মহাদেবী বর্মা ছিলেন ছায়াবাদী কবিদের মধ্যে অন্যতম। ছায়াবাদী কবিদের মতই তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছিল ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি ও অতীন্দ্রীয় মানসলোকের অপূর্ব বীক্ষণ। আলোচ্য কবিতায় সেই অনুভব গীতিময় হয়ে উঠেছে। নীহার, রশ্মি, নীরজা ও সান্ধ্যগীত এই চারপর্বকে দিনের চার প্রহরের সঙ্গে সমীকৃত করে মহাদেবী বর্মা কাব্য রচনা করেন। কবির আত্মতপস্যা রূপকের আশ্রয়ে এই কবিতায় সুবিন্যস্ত ও সর্বজনীন চরিত্র লাভ করেছে। নিজের অবিনশ্বর আত্মাকে তিনি সদাজাগ্রত দেখেন; তার প্রদীপ্ত আলোয় সমস্ত অনানিশা কেটে যাবে এমন প্রত্যাশা করেন। ঈশপনিষদের বাণী আছেঃ "হীরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যপিহিতং মুখম। / তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টায়"। এখানেও যেন কবি আত্মার হিরন্ময় পাত্রের দীপ্ত শক্তির ওপর ভরসা রাখেন। সমস্ত অন্ধকার, অমানিশা কাটিয়ে আত্মার এই শক্তিতেই তিনি জীবনের প্রদীপ জ্বালিয়ে নেবেন। প্রাণশক্তির উন্মাদনা আজ যেন ক্ষিতিজের বদ্ধ কারাগার ভেঙে উন্মাদের মত স্ফুরিত হয়ে পড়বে। দীপক রাগিনীতে গেয়ে যাবে গান—কবির আত্ম-সঙ্গীত। কবির আত্মশক্তির এই পবিত্র সুরধ্বণি দ্যুলোক-ভূলোকের মেঘের আবরণ ও নৃত্য বিভোর তড়িৎ-এর ছটাকেও ছাপিয়ে উঠেছে। অমোঘ কোনো বিশ্বাস ও শক্তির অন্তর্গত স্বর যেন সেই দীপক রাগিনীর গানে জড়িয়ে আছে। কবি মহাদেবীর ভাবনা কিন্তু মর্ত্যের পৃথিবী ছেড়ে উন্মার্গগামী

নয়; বরং মর্ত্যধূলির পথে পথে যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ তৃণদল তাদের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গেও নিজের জীবনবীণার সুরকে কবি মিলিয়ে নিতে চান।

কবির প্রবল প্রাণশক্তি বা আত্মশক্তির এই প্রকাশ কিন্তু মদমত্ত নয়। আত্মস্বরের আততি তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করে জীবনের সমস্ত কোমল স্বপ্নগুলিকে। এখানেই মহাদেবীর কাব্যের রোম্যান্টিকতা। গীতিকবিতার সুরমূর্ছনা তাঁর কাব্যের সম্পদ তা আমরা আগেই বলেছি। এই কবিতায় সেই আত্মগত সুরের স্বতোৎসারণ পরিলক্ষিত। রাত্রের তারা যখন অবসৃত হয়, ভ্রান্ত মরুৎ যখন পথহারা হয়ে পড়ে, উল্কাখন্ড আকাশের প্রান্তে আলোক বিচ্ছুরিত করতে করতে নিভে যায়, ধ্বংসের ভূ্যলোক বিস্তারী প্রকাশের দাঁড়িয়ে কবি তাঁর কোমল স্বপ্নগুলিকে ঠিক যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখবেন। এই ভরসাতেই তিনি জ্বালিয়ে নেবেন সব দীপমালা। মহাদেবীর ছায়াবাদী ভাবনায় মিস্টিসিজম আছে; সেই মিস্টিক ভাবনায় সুর, আলো, অন্ধকার যেন আত্মার অন্তঃশ্চারী স্বর হয়ে ওঠে। মৃদু বর্তিকার মত সুরের কাঁপুনিকে কবি তুলনা করেন দীপশিখার সঙ্গে। আসলে এ তো চৈতন্যের দীপশিখা। জীবনের সার স্বরূপ। পার্থিব জীবনে নয় অপার্থিব কোনো প্রাপ্তির আশার এই দীপশিখা জ্বলে চিরন্তন। প্রাত্যহিক মনের যত চাওয়া-পাওয়া তার ঊর্ধ্বে উঠে এই আত্মার শিখা প্রজ্জ্বল। ধূলিমলিন পার্থিব টানাপোড়েন সিক্ত জীবনের অশ্রুজল একদিন শেষ হয়ে যায়; শরীর ছেড়ে যায় মর্ত্যলোক—কিন্তু কবি অনুভব করেন আত্মার শুভত্ববোধ থেকে যায়। মরণের পথ অতিক্রম করে জীবনের আলোর দীপাবলী তিনি প্রস্তুত করে যেতে চান। রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন আমরা পাই, "জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে/ বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে"—তেমনই এই আত্মার হিরন্ময় পাত্র যেন অপাবৃত হবেই জীবনের ওপারে।

রোম্যান্টিকতার বিশেষ ভাবটিই মুহূর্তের। কোমল প্রাণের ব্যথাকে অতিক্রম করে, অশ্রুসজল কারুণ্যের বিপ্রতীপে জীবনের সমস্ত না-পাওয়া কোমল সাধগুলি যেন কবি উদযাপন করছেন আজ। জীবনের ক্লেদ-শূণ্যতা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে কোনো অবিশ্বাস্য আলোয় আজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কবির মনে। ঘুম পাড়ানিয়া সেই সাধগুলির প্রদীপ্ত প্রকাশের মধ্যে আজ জীবনের সার্থকতা প্রতিধ্বণিত হচ্ছে। জীবনের যে নদী তার তীর দেখার আজ কোনো প্রয়োজন নেই, আজ তিনি সওয়ার হয়েছেন আকাঙ্ক্ষার সুপ্তির থেকে জীবনের ঊর্ধ্বচারী পথে। জীবনরূপ নদীর চারদিকে গর্জন, কুলহীন ঠিকানাহীন সেই প্রচন্ড জোয়ারের মধ্যে কবি পার হয়ে যাবেন প্রলয়—এই তার স্থির বিশ্বাস। অবিচল জীবন বিশ্বাসে দীপক রাগিনীর সুর শুনিয়ে যাবেন তিনি। সমস্ত নেভা দীপ জ্বালিয়ে নেবার দীপ্ত পথে কবি পালন করে যাবেন তাঁর দায়। আত্মদীপের প্রজ্জ্বলিত শিখা অনির্বান রাখবেন।

মহাদেবীর কাব্যে তাঁর চিত্রাঙ্কনীপ্রতিভার দীপ্তিও বিচ্ছুরিত হয়েছে। শব্দের যৌবন ও

টিপ্পনী

রেখার কৌমার্য উভয় চারিত্রই তাঁর কাব্যের চিত্রকল্পগুলিকে চৈতন্যময় করে তুলেছে। তাঁর 'দীপশিখা' কাব্যটি এই বৈশিষ্ট্যের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যায়, মোহনলাল মহতী (কাব্যকলায়), রামাগোপাল বিজয়বর্গীয় (চিত্রকলায়) প্রমুখ ব্যক্তিত্বের। মহাদেবীর কাব্যকলায় এই দু'য়ের সংমিশ্রণ লক্ষ্যনীয়। 'যামা' কাব্যগ্রন্থ থেকে তাঁর কাব্যের চিত্রকল্পের পরিবর্তন আসতে থাকে। অপূর্ব চিত্ররূপময়তার সঙ্গে পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে চৈতন্যের মিস্টিক ভাব। গীতিধর্মীতা সেই মিস্টিক ভাবকে আরও গভীর ও অর্থপূর্ণ করে তুলেছে। ছায়াবাদী কবিদের প্রারম্ভে যে কায়াবাদের প্রপঞ্চ তৈরি হয়েছিল, অনেকেই ভেবেছিলে মহাদেবীর কাব্যের পর সেই ধারা দীর্ঘস্থায়ী হবে। কিন্তু মহাদেবীই শেষ পর্যন্ত এই কায়াবাদের ছায়াকে কাটিয়ে ওঠেন চেতনার দীপ্তি ও ভাবনার গাম্ভীর্যে। অথচ নিতান্ত সংসারী একজন নারী পার্থিব তুচ্ছতাকে কী অপরিসীম মমত্বে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তা তাঁর কবিতায় পরিস্ফুট হয়। তিনি বলেছেন, ‘‘আমার ব্যক্তিত্বময় জীবন কাব্যের নির্মাণ ছাড়া অন্যত্র দৃকপাতে বিশেষ অবকাশ দান করে নি। পরিবর্তনশীলতার নাম জীবন।এই পরিবর্তনের মাঝেই স্থায়ী মূল্যের সন্ধান। বর্তমানের সংসার হৃদয়চৈতন্যে জড়িত। প্রতিটি শ্বাসভরা সময়ের ইতিহাস আমরা লিপিবদ্ধ করতে চাই। প্রতিটি কম্পন, নিঃশ্বাস, স্বপ্নকে প্রতিভাত দেখতে উন্মুখ’’। কথাগুলি মহাদেবী বর্মার আন্তরিক মনের কথা। জীবনের প্রতি ভালবাসা থেকেই তিনি জীবন ছাড়িয়ে যাওয়া আত্মার দীপ্তির সন্ধানে পথ চলেছেন। কখোনো তা দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠেছে কখোনো রহস্যাবৃত। আত্মার গুণরূপে এই রহস্যাবৃত চেতনার ব্যাখ্যা মহাদেবীর কাব্যে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। পার্থিব জীবনের উপলব্ধিকে কাব্যে তিনি অপার্থিবের পথে এগিয়ে দিয়েছেন কখনো কখনো। এই কবিতাটির মধ্যে সেই অন্তর্গত সুর ধ্বণিত হয়েছে। আত্মার পবিত্র দীপ্তি ও তার শিখাকে দেখেছেন জীবনেরই সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কিন্তু তার বিস্তার ঘটিয়েছেন চৈতন্যের অন্তঃশ্চারী ঊর্ধমুখীতায়।

২.৪. অমৃতা প্রীতমের কবিতা

সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয় :

পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলায় ১৯১৯ সালের ৩১ শে আগষ্ট অমৃতা প্রীতমের জন্ম হয়। তাঁর পিতা কর্তার সিং হিতকরী ছিলেন ব্রজভাষার একজন পন্ডিত আনুষ। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছিল তাঁর পেশা। শিখ ধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক কর্তার সিং কন্যার জন্মের এগার বছরের মধ্যে স্ত্রীকে হারান এবং কন্যাকে নিয়ে লাহোরে বসবাস করতে শুরু করেন। ছোট বয়সে মার্তহীনতা অমৃতাকে এক আশ্চর্য একাকীত্বের ভুবনে নিয়ে যায়। এই এককীত্ব থেকে বাঁচতে তিনি লেখালিখি শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে অমৃতা এক পত্রিকা সম্পাদককে বিবাহ করেন এবং

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্বামীর নামের পদবী ব্যবহার করে অমৃতা প্রীতম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এবছরই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অমৃত লহ্‌রেঁ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ তাকে পাঠকসমাজে প্রাথমিক পরিচিতি দিয়েছিল। প্রথম জীবনের এই রোম্যান্টিকতা পরবর্তিতে বিভিন্ন দেশীয় ও উপামহাদেশীয় ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে তাঁর সংগ্রামী চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। চল্লিশের দশকের উত্তাল সময়ে তিনি যোগ দেন 'আঞ্জমন তরক্কি পসন্দ মুসান্নাফি - এ হিন্দ' নামক একটি প্রগতিবাদী লেখক সঙ্ঘে। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লোকপ্রিয় রচনা 'লোক পীড়' গ্রন্থটি। স্বাধীনতের পর অমৃতা প্রীতম পরিবারসহ লাহোর ছেড়ে চলে আসেন দিল্লীতে। শেষ জীবন পর্যন্ত দিল্লিতেই ছিলেন। এসময় দিল্লিতে গুরু রাধাকিষণ এর উদ্যোগে যে গণগ্রন্থাগার তৈরি হয়েছিল তাতে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন অমৃতা প্রীতম।কিন্তু অমৃতার দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন সরল ছিল না। ১৯৬০ সালে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া রেডিওতে কাজ করতেন অমৃতা। উর্দূ কবি সাহির লুধিয়ানভির সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক এর একটি অন্যতম কারণ। কিন্তু সাহির লুধিয়ানভির পরবর্তীতে কণ্ঠশিল্পী সুধা মালওত্রার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠলে অমৃতা বাকি জীবন লেখক ইমরোজের সান্নিধ্যে কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর দিল্লির হৌস খাসের বাসভবনে অমৃতা প্রীতমের জীবনাবসান ঘটে ২০০৫ সালের ৩১ শে অক্টোবর।

অমৃতা প্রীতম ভারতবর্ষের অন্যতম খ্যাতিমান একজন কবি ও লেখক। ১৯৬৫ সালে তিনি 'সেনেহে' নামক দীর্ঘ কবিতার জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮২ সালে পান জ্ঞানপীঠ পুরস্কার কাগজ তে ক্যানভাস' উপন্যাসের জন্য। ১৯৬৯ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০০৪ সালে পদ্মবিভূষণ উপাধি লাভ করেন। অমৃতা প্রীতম ছিলেন একজন সাহিত্য অকাদেমি ফেলো। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের সংসদে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন।

অমৃতা প্রীতমের সাহিত্যকৃতি :

প্রায় ছয় দশকের সাহিত্য জীবনে অমৃতা প্রীতম আঠাশটি উপন্যাস, আঠারটি কাব্যগ্রন্থ ও ছোটগল্প সংকলন এবং প্রায় ষোলটি বিভিন্ন কবিতা সংকলন রচনা করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যসংকলন ও উপন্যাসের তালিকা নিচে দেওয়া হল।

উপন্যাস :

পিঞ্জর, ডক্টর দেব, কোরে কাগজ্‌, উনঞ্চাশ দিন, রং কী পাত্তা, দিল কী গলিয়াঁ, জীলাবতন্‌, হারদাত্ত কী জিন্দেগীনামা ইত্যাদি।

কাব্যগ্রন্থ :

অমৃত লহরেঁ, জীউন্দা জীবন (১৯৩৯), ত্রেল ধোতে ফুল (১৯৪২), ও গীতাম ভালিয়া (১৯৪২), বদলাম দে লালী (১৯৪৩), সাঁঝ কে লালী (১৯৪৩), লোক পীড়া (১৯৪৪), পাঞ্জাব কী আওয়াজ (১৯৫২), সুনহেরে (১৯৫৫), অশোকা চেতী (১৯৫৭), কস্তুরী (১৯৫৭), নাগমণি (১৯৬৪), ইক সি অনিতা (১৯৬৪), চাক নম্বার চাত্তি (১৯৬৪), উনিনজা দিন (১৯৭৯), কাগজ দে ক্যানভাস (১৯৮১), চুনি হুয়ি কবিতায়েঁ।

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ :

রাশিদি টিকিট ৯১৯৭৬), শ্যাডো অব ওয়ার্ডস (২০০৪), এ রেভেনিউ স্ট্যাম্প।

গল্পগ্রন্থ :

কাহানীয়া জো কাহানীয়া নেহী, কাহানীয়া কী আঙ্গন মে, স্টেঞ্চ অব কেরোসিন।

অমৃতা প্রীতমের লেখালেখি আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়। একদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের পার্টিশন অন্যদিকে ভারতীয় নারীজীবনের কাহিনিকার হিসেবে তাঁর তুলনা মেলা ভার। ১৯৫৬ সালে তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা কথাকার হিসেবে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান । তাঁর রচিত ‘পিঞ্জর উপন্যাসটি পরবর্তীতে ভারতীয় পার্টিশনেদর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল হয়ে উঠেছিল। পার্টিশন যখন হয় তখন অমৃতা প্রীতমের বয়স ২৮ বছর। লক্ষ লক্ষ নারী - পুরুষের মত অমৃতার পারিবারকেও উৎপাটিত করে দেয় দেশভাগ। লাহোর ছেড়ে দিল্লিতে চলে আসেন তারা। এসময়ের অমূল্য দলিল হয়ে আছে তাঁর কবিতা। ১৯৬০ সালের পরবর্তীতে তাঁর লেখার মধ্যে নারীবাদী চেতনা আরও প্রগাঢ় হতে থাকে। অমৃতা প্রীতম ‘নাগমণি’ নামে পাঞ্জাবী ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা সাহিত্য সম্পাদনা করতেন। প্রত্রিকাটি বেশ কিছুদিন চলছিল।

মূল কবিতা :

ওয়ারিশ শহকে বলছি
আজ ওয়ারিশ শাহকে অনুরোধ করি
কবর থেকে কথা বল
আর ভালোবাসা বইটার পাতা উলটে দেখো।

যখন পাঞ্জাবে উপকথার মেয়ে কাঁদে

তখনও তার নীরব বেদনার ভাষা যোগায়
আর যখন লক্ষ লক্ষ মেয়ে কাঁদছে
তখন তাদের দুঃখের ভাষা দিতে
ওয়ারিশ শাহ আজ কোথায়?

টিপ্পনী

পঞ্চ নদীর জলে
কেউ ঢেলে দিয়েছে বিষ
সেই বিষজলে মাঠে মাঠে আজ
হয় বিষের চাষাবাস।

আজ উর্বর জমিতে গজিয়ে উঠেছে
অসংখ্য বিষে ভরা চারাগাছ
দিগন্তে ছড়িয়ে আছে পীতাভ রক্তের রং
আর অনেক ওপরে আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে আভিশাপ
বনে বনে বয়ে যাওয়া বিষাক্ত বাতাস
বাঁশ গাছের চারাগুলোকে গোখরো করে তুলেছে।

বিষধর হতভাগ্য মানুষগুলোকে
একেবারে মোহিত করেছে
অচিরেই পাঞ্জাবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব নীল হয়ে গেল।
পথে পথে হারিয়ে গেল গান
চরকার সুতো গেল থেমে।

ছোট মেয়েরা পালাল গুনগুনিয়ে বোনার কাজ ফেলে
আর চরকার ঘরঘর শব্দ বন্ধ হয়ে গেল
নৌকাগুলো ভেসে গেল ফুলশয্যা নিয়ে

সশব্দে গাছের শক্ত ডালপালা ডানা মেলে আঁচড়ায়।
ভালোবাসার নিঃশ্বাস ভরা বাঁশি
হতবুদ্ধি হয়ে হারিয়ে গেছে কবে
রাঞ্ঝার ভাইগুলো সব ভুলে গেছে
কী করে বাজাতে হয় ওই বাঁশি
পৃথিবীতে রক্ত বৃষ্টি ঝরে ঝরে
কবরে ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

ভালবাসার উপত্যাকা আজ
রাজকুমারী হয়ে কবরে বসে কাঁদে।

শয়তানের আজ
ভালোবাসা আর সৌন্দর্যের চর সেজে
দাপাদপি করে।

আমারা কোথায় পাব
আর একজন ওয়ারিশ শাহকে?

আজ আমি অনুরোধ করি
ওয়ারিশ শাহকে
কবর থেকে কথা বল।
আর ভালবাসা বইটার পাতা উলটে দেখো। (অনুঃ বিপ্লব চক্রবর্তী)

কবিতাটি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কথা :

আগেই বলা হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের পার্টিশন যে কয়েকটি সাহিত্যিক প্রতিমানের মধ্য দিয়ে চিরকাল পরিচিত থাকবে পাঠকের কাছে তাঁদের একজন অমৃতা প্রীতম।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আলোচ্য কবিতা ‘ওয়ারিশ শাহকে বলছি’ কবিতাটি অমৃতা প্রীতমের অত্যন্ত আলোচিত ও বিখ্যাত একটি কবিতা - যা পার্টিশনের মর্মযন্ত্রণাকে চিরকালীন করে রেখেছে। একটি দেশভাগ উন্মূলিত পরিবারের নারী হিসেবে সেই নারকীয় বীভৎস এক্সোডাসকে দেখেছিলেন তিনি। সেই মর্মযন্ত্রণা প্রায় সারাজীবন বহন করে বেড়িয়েছেন তিনি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর দাঙ্গা লাগে। লাহোরের বাস ছেড়ে দিল্লি চলে আসতে হয় অমৃতাকে। ১৯৪৮ তিনি অন্তস্বত্বা থাকাকালীন একবার দিল্লি থেকে দেরাদুন যাচ্ছিলেন - সে সময় তাঁর মনের ভাব এই কবিতাটিতে ধরা আছে। পরবর্তিকালে কবিতাটি আলোড়ন তুলেছিল, বহুপাঠে পরিচিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। ওয়ারিশ শাহ (১৭২২ - ১৭৯৮) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের একজন বিখ্যাত সুফী কবি। পাঞ্জাবী সাহিত্যে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত। অবিভক্ত পাঞ্জাবের জান্ডিলা শের খান, যা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত, প্রদেশে এক প্রভাবশালী অভিজাত পরিবারে ওয়ারিশ শাহের জন্ম হয়। সয়ীদ্ মুহাম্মদ আল - মাক্কি ও তাঁর পুত্র সয়ীদ বদরুদ্দিন এর বংশধর ছিলেন ওয়ারিশ শাহ। পিতা ছিলেন গুলশের শাহ্। শৈশবকালে ওয়ারিশের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। ওয়ারিশ নিজেকে উস্তাদ কাসুরের (যার নাম ছিল হাফিজ গুলাম মুর্তাজা) শিষ্য বলে দাবী করতেন। তার অভিভাবকত্বে শিক্ষালাভ করেন ওয়ারিশ শাহ; শিক্ষান্তে পাকপাট্টান থেকে বারো কিমি দূরবর্তী এক গ্রাম মালকা আন্স এ চলে আসেন তিনি। একটি ছোট মসজিদের পাশ্ববর্তী এক ছোট ঘরে তিনি সারাজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর মসেলিয়াম আজ তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। ওয়ারিশ শাহের পাঞ্জাবী সাহিত্য বিশেষ অবদান ছিল। তার শ্রেষ্ঠ রচনা ‘হীরা রাঞ্জা’ কাব্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঞ্জাবের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় তাঁর কাব্যে উঠে এসেছিল। পাঞ্জাবী জনজীবনের রঙিন ও উজ্জ্বল প্রতিচিত্রণ থাকার ফলে কাব্যটি বহুল পঠিত এবং এর বিভিন্ন পঙক্তি আজও পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের মুখে প্রচলিত। ওয়ারিশ শাহের সুফী পদগুলি অষ্টাদশ শতকের গার্হস্থ সংস্কৃতির উদাহরণ হয়ে আছে। ঈশ্বরের প্রতি মানবপ্রেমের যে মিস্টিক সাধনা সুফী ধর্মে পরিলক্ষিত হয় ওয়ারিশ শাহের কাব্যে সে মিস্টিকতার ছায়াপাত দেখা যায়। বলা যায় মধ্যযুগের প্রেমকাব্যে ওয়ারিশ শাহের কাব্য এক প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা।

অমৃতা প্রীতমের এই কবিতাটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল পাঞ্জাব ও পাকিস্তানে। পাকিস্তানি -পাঞ্জাবী চলচিত্র কর্তার সিং এ এই কবিতাটি ব্যবহৃত হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে। সেখানে ইনায়ৎ হুসেন ভাট্টি নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। মীকাল হাসান ২০০৪ সালে এই কবিতাটি গান হিসেবে রেকর্ড করে একটি এলবাম প্রকাশ করেন সেটির নাম ছিল ‘সম্পূরণ’ আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একটি মাইল ফলক হয়ে উঠেছে কবিতাটি, বিশেষত ভারতীয় পার্টিশন সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিতাটি একটি যুগচিহ্নের মত।

বিশ্লেষণী পাঠ :

আলোচ্য কবিতাটিতে একজন পাঞ্জাবী নারী হিসেবে দেশভাগ - উত্তর পাঞ্জাবের মাটিতে দাঁড়িয়ে অমৃতা প্রীতম ওয়ারিশ শাহকে স্মরণ করেছেন। এই মানবিক বীভৎসতার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি ওয়ারিশ শাহের সঙ্গে কথা বলতে চান। কবর থেকে উঠে এসে ওয়ারিশ শাহ্ কী সেই প্রেমের সঙ্গীত আজ শোনাতে পারবেন। মানবজীবনের পক্ষে আজ বড় দুঃসময়, আজ প্রয়োজন সে ওয়ারিশ শাহের অমলিন জীবন প্রেমের কাব্য। অমৃতা বিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে স্মরণ নিয়েছেন ওয়ারিশ শাহের মত এক সুফী সাধকের। প্রায় দুই শত বছর আগে হীরা রাঞ্জার যে প্রণয় কাহিনী লেখা হয়েছিল আজ তার প্রাসঙ্গিকতা কী? লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা, নিজের দেশের টুকরো হয়ে যাওয়া, ধর্মের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ, উদ্বাসিত জনজীবনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির কথা কী ওয়ারিশ শাহ কখনো ভেবেছিলেন? তিনি ছিলেন পাঞ্জাবী জনজীবনের দরদী শিল্পী, শুভার্থী। এক রঙ্গীন, উজ্জ্বল, শস্যশ্যামলা পাঞ্জাবের চিত্র তুলে ধরেছিলেন ওয়ারিশ তাঁর কাব্যে। কিন্তু আজ পাঞ্জাবের সেই শস্যম্যামলা মাঠ বিষাক্ত, মানুষের রক্তে কালো হয়ে গেছে। চারপাশে মানুষের শব - যেন সেই উজ্জ্বলতা ধূসর হয়ে গেছে। পঞ্চ নদীর যে জল জীবনের প্রতীক, মানবত্মার প্রবহমানতার প্রতীক, সে জলে আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিষ; ঘৃণার বিষ। ধর্মের বেশাতি করে রাষ্ট্রের বুকে চিরস্থায়ী ভাঙন যারা ধরিয়ে দিয়ে গেল তাদের দেখলে ওয়ারিশ শাহ আজ কী বলতেন। পাঞ্জাবের মাঠে ঘাটে, পথ-প্রান্তরে আজ বিষময় সাম্প্রদায়িকতার চাষ হচ্ছে। উর্বর জমি ভরে উঠেছে বিষের চারাগাছে। আকাশ থেকে যেন অভিশাপ ঝরে পড়ছে, আওয়া - বাতাস বিষাক্ত। মানুষের মনে কোনো প্রেম নেই, পারস্পরিক দ্বন্দ্বে আত্মঘাতী হয়েছে তারা। এই প্রানঘাতী ভ্রাতৃত্ব হন্তারক আবহে ওয়ারিশ শাহকে অমৃতার মত একজন সাধারণ নারী অনুরোধ করেছেন : "কবর থেকে কথা বল / আর ভালবাসার বইটার পাতা উলটে দেখো"। ওয়ারিশ শাহ, পাঞ্জাবের প্রতিটি গ্রামে গঞ্জের নিভৃত কোণে যখন কোনো মেয়ে কাঁদে তখন তোমার কবিতার পঙক্তি তাকে ভাষা যোগায়; কিন্তু আজ লক্ষ লক্ষ মেয়ে ক্রন্দনরত - তাদের দুঃখের ভাষা আজ কে দেবে? জেগে ওঠো ওয়ারিশ শাহ, তাদের ভাষা যোগাও। মানুষ বড় কাঁদছে, মেয়েরা বড় একলা আজ। দেশভাগের বর্বরতা, উদ্বাসনের বিধ্বংসী মহাযজ্ঞে পাঞ্জাবের নারীরা আজ বড় অসহায়। অমৃতা যেন তাদের একজন হিসেবে প্রার্থনা করেছেণ; সে প্রার্থনা কোনো ঈশ্বরের কাছে নয় - সে প্রার্থনা এক কবির কাছে, যিনি অনেকদিন আগে তাদের মানবপ্রেমের গান শুনিয়েছিলেন। অমৃতার এই অনুরোধের মধ্যে লুকিয়ে আছে অনুযোগের সুর, মানবপ্রেমের প্রতি ব্যঙ্গের বিরোধাভাস। এত বিখ্যাত, সুন্দর, অপূর্ব প্রেমকাব্য যে মাটিতে লেখা হয়েছিল সেখানেই তো ঘটে গেল এই মর্মবিদারক বিভাজন। জন্মভূমি ছেড়ে অজানা ঠিকানায় সরে যেতে হ'ল অসংখ্য মানুষকে

টিপ্পনী

চিরকালের জন্য। পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল যাঁর কাব্য তাঁকে কবরের থেকে উঠে আজকের বিষাক্ত মানবিক মহামারী দেখতে অনুরোধ করেন অমৃতা প্রীতম। সাহসী সেই বয়ান, আত্মবিশ্বাসী সেই উচ্চারণ।

পাঞ্জাব শস্যশ্যামলা দেশ। সেই দেশের মাটি আজ রক্তে ভিজে গেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শবদেহগুলি শ্মশান করে তুলেছে পাঞ্জাবকে। উর্বর জমিতে গজিয়ে উঠেছে বিষাক্ত চারাগাছ ; পাঞ্জাবের মানুষের মনে সম্প্রীতির যে উর্বর জমি ছিল তা আজ সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয়ের আবহে মাথা তুলেছে লোভ, রিরংসা। হতভাগ্য উদ্বাস্তু মানুষগুলি শিকার হচ্ছে সেই বীভৎস লোভের। পথের গান হারিয়ে গেছে, চরকার সুতো কাটা বন্ধ হয়েছে; মেয়েগুলির গুণগুন সুরের গান থেকে গেছে, ঘাটের নৌকাও ভেসে গেছে। গাছের ডালাপালা যেন ডানা মেলে আঁচড়াতে আসছে। ওয়ারিশ শাহের কাব্যে আমরা যে রাঞ্ঝার বাঁশির কথা শুনেছিলাম, আজ তার এত বছর পর যেন তার ভাইয়েরা সেই বাঁশি বাজাতে ভুলে গেছে। আকাশ থেকে রক্ত পড়ছে, সেই রক্ত যেন ঢুকে পড়েছে ওয়ারিশ শাহের কবরেও। জাগো, জেগে ওঠো ওয়ারিশ শাহ, আবার গান শোনাও; শোনাও তোমার প্রেমের গান। আজ তোমার কাব্যের ভালোবাসা ছড়ানো খুব দরকার। তোমার কাব্যের উপত্যাকায় রাজকুমারী কাঁদছে; চারিদিকে শয়তানের দাপাদাপি। তারা ভালোবাসার চর সেজে লুণ্ঠন করছে এখানের রাজকুমারীদের। এখন তোমাকে খুব দরকার। কথা বলো ওয়ারিশ শাহ, তোমার ভালোবাসার বইটার পাতা উল্টিয়ে আমাদের পড়াও - এই মৃত্যু উপত্যাকায় প্রেমের সুবাতাস খুব দরকার। অমৃতা প্রীতম তাঁর কবিতায় এরকম ভাবেই একজন ইতিহাসখ্যাত কবিকে পরম আকুতি জানান। দেশভাগের বীভৎস মানবিক স্খলনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর এই হৃদয়ের আকুতি পাঠকের মনকে স্পর্শ করে। "আমরা কোথায় পাব / আর একজন ওয়ারিশ শাহকে" - এই পঙক্তিটি যেন কানে বাজতে থাকে। আমরা জানি হীরা রাঞ্জার প্রেমকাহিনি সারা পাঞ্জাবের লোকমুখে শতকের পর শতক ধরে ঘুরছে। অপূর্ব সুন্দরী জাঠ রমণী হীরা ও ধীড়ো 'যার পদবী ছিল রাঞ্জা)র প্রেমকাহিনি যে অমর প্রেমের কল্প ইতিহাস নির্মাণ করেছিল আজ তার আবাহন খুব প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলীঃ

১। গালিবের জীবন ও কবিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। গালিবের শেরগুলির অন্তর্নিহিত মর্মবাণী সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করুন। আপনার পঠিত শেরগুলি থেকে এর উদাহরণ দিন।

৩। গালিবের প্রেমভাবনা তাঁর শেরগুলিতে কেমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা

আপনার পঠিত শেরগুলি পাঠ-অভিজ্ঞতার নিরিখে আলোচনা করুন।

৪। আত্মভাবনা ও আত্মউন্মোচনের কুশলী ভঙ্গিমায় গালিবের শেরগুলি শিল্পোত্তীর্ণ—আলোচনা করুন।

৫। আধুনিক অসমীয়া কাব্যসাহিত্য নবকান্ত বড়ুয়ার অবদান ও গুরুত্ব আলোচনা করো।

৬। 'কার্ফুর সময় হল' কবিতাটির মর্মার্থ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭। 'কার্ফুর সময় হ'ল' কবিতাটির কাব্যরূপে চিত্রকল্পের ব্যবহার কেমন ভাবে কাব্যরসত্তীর্ণ হয়েছে আলোচনা করো।

৮। অমৃতা প্রীতমের জীবন ও সাহিত্যকৃতির ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করো।

৯। 'ওয়ারিশ শাহকে বলছি' কবিতাটি দেশভাগের মর্মযন্ত্রণাকে কেমনভাবে পরিস্ফুট করেছে আলোচনা করো ।

১০। ওয়ারিশ শাহকে কী কৈফিয়ৎ কবি দিয়েছেন? কবির বর্তমানের প্রেক্ষিতে ওয়ারিশ শাহ কেন প্রাসঙ্গিক?

১১। 'ওয়ারিশ শাহকে বলছি' কবিতাটি একদিকে যেমন পার্টিশন বিধ্বস্ত পাঞ্জাবের বর্তমানকে ইতিহাসের বিপ্রতীপে নিয়ে যায় অন্যদিকে বীভৎস অমানবিকতার বিকার থেকে পরিত্রানের পথ খুঁজতে ইতিহাসের কাছে নিয়ে যায়—আলোচনা করো।

১২। মহাদেবী বর্মার জীবন ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

১৩। ছায়াবাদ কী? হিন্দি কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ছায়াবাদী কবি মহাদেবী বর্মার ভূমিকা কী?

১৪। 'সব নেভা দ্বীপ জ্বালিয়ে নেব' কবিতাটির মর্মকথা বিষয়ে আলোচনা করো।

১৫। 'সব নেভা দ্বীপ জ্বালিয়ে নেব' কবিতাটির মধ্যে মহাদেবী বর্মার কবি-মনোভূমির কেমন ছবি পাওয়া যায় আলোচনা করো।

১৬। মহাদেবী বর্মা রচিত 'সব নেভা দীপ জ্বালিয়ে নেব' কবিতাটির চিত্রকল্প কীভাবে কবিমানসকে পরিস্ফুট করেছে আলোচনা করো

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তৃতীয় একক : নাটক ‘আধে আধুরে’ : মোহন রাকেশ

নাট্যকার মোহন রাকেশ :

মোহন রাকেশ জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৫ সালের ৮ই জানুয়ারী অমৃতসরের চন্ডীবলীতে। রাকেশের পরিবার ছিল বৈষ্ণব। বাড়ীর সংলগ্ন যাযাবরদের জীবন তাঁকে ছোটবেলা থেকেই তাড়িত করেছিল। উচ্চশ্রেণীর বংশে ঠাকুমার কঠোর দৃষ্টি সেই মেলামেশায় বাধার সৃষ্টি করে। রাকেশ ছোটবেলা থেকেই মা'কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। নিজের আত্মজীবনীমূলক রচনায় মা'র প্রতি এই ভালবাসার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছে। বাবার মৃত্যুর পর তাদের খুবই অর্থকষ্ট চলে। অনেক কষ্টে ও পরিশ্রমে জীবনে দাঁড়িয়েছিলেন মোহন রাকেশ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর লাহোর ত্যাগ করে দশ বছর যোধপুর, বোম্বাই, জলন্ধর, সিমলা, পুনরায় জলন্ধর ইত্যাদি শহরে কাটাতে থাকেন তিনি। জীবনের শেষ দশ বছর তিনি দিল্লিতে কাটিয়েছিলেন। নিয়মিত বাড়ী পালটানো ছিল তার ভবিতব্য। কোনো জায়গাতে স্থির হয়ে বসতে পারেন নি মোহন। তাঁর তিনটি বিবাহ। দুটি বিবাহ বিধিয়মাফিক ও শেষটি গন্ধর্বমতে। প্রথমস্ত্রীর গর্ভে একটি সন্তান নবনীত, যাকে খুব ভালবাসতেন মোহন। ‘এক ঔর জিন্দেগী’ তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আর সন্তানকে নিয়ে রচিত। মোহনের বন্ধু মহল ছিল খুব বড়। উপেন্দ্রনাথ আশক্, মনু ভান্ডারী, কমলেশ্বর, জওহর চৌধুরি, রাজেন্দ্র যাদব, ধর্মবীর ভারতী, পুষ্পা ভারতী, শ্যামানন্দ জালান এঁরা সকলেই মোহনের ঘনিষ্ট ছিলেন। বাবার মৃত্যু, দিদির মৃত্যু, দুটি বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ রাকেশের মন ভেঙে ফেলেছিল সময়ে সময়ে। তবু তিনি লেখালিখি চালিয়ে গেছেন। পরিমাণে অল্প হলেও ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য কর্মের সঙ্গে পরিচিত হলেই সেই গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করা যায়।

মোহন রাকেশের সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

গল্পসংগ্রহ :

ইনসান কে খন্ডহর (১৯৫০); নয়ে বাদল (১৯৫৭); পাঁচ লম্বী কাহানিয়াঁ (১৯৬০); এক আউর জিন্দেগি (১৯৬১); সুহাগিনেঁ (১৯৬৬); আজ কে সায়ে (১৯৬৭); রোঁয়ে রেশে (১৯৬৮); এক এক দুনিয়া (১৯৬৮); মিলে-জুলে চেহেরা (১৯৬৯); কোয়ার্টার (১৯৭২); ওয়ারিশ

(১৯৭২); পহ্‌চান (১৯৭২)।

উপন্যাস :

অন্ধেরে বন্ধ কামরে (১৯৬১), না আনেওয়ালা কাল (১৯৬৮), অন্তরালে (১৯৭২)

নাটক :

আষাঢ় কা একদিন (১৯৫৯), লহরোঁ কে রাজহংস (১৯৬৩), আধে আধুরে (১৯৬৯), পৈর তলে কী জমীন (১৯৭৫)।

টিপ্পনী

প্রবন্ধ / গদ্য :

পরিবেশ (১৯৬৭), সময় সারথী (জীবনী, ১৯৭২), সাহিত্যিক আউর সাংস্কৃতিক দৃষ্টি (১৯৭৫), বকলম খুদ (১৯৭৪), মোহন রাকেশ কী ডায়েরি (১৯৮৫)।

মোহন রাকেশের নাটক :

স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় সাহিত্যে সৃজনাত্মক চেতনার বিকাশে লেখকেরা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ে বিশিষ্ট ছিলেন। রঙ্গমঞ্চে অভাবের কারণেই মূলত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার নাট্যকারদের নাটক রচনায় বিশেষ কোনো প্রেরণা ছিল না। হুনি সাহিত্যে এই অভাব খুবই প্রকট; ভারতেন্দু ও জয়শঙ্করপ্রসাদ এঁদের মধ্যে ব্যাতিক্রম হতে পারেন কিন্তু স্বাধীনতা - উত্তর কালেই মূলত হিন্দি নাটক রচনায় গতি এসেছিল। নতুন নতুন নাটকের দল, সরকারী পোষকতা ও কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনেদর ফলে দেশের বিভিন্ন নাগরিক কেন্দ্রগুলিতে নাটকচর্চায় গতি এল। বিশেষত কলকাতা, বোম্বাই ও দিল্লিতে নাট্যপ্রযোজনায় এগিয়ে এলেন অনেকে। রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকর্মীদের উদ্যোগে নাটক - লিখিয়েরা এগিয়ে এলেন। স্বাধীন দেশের সমুপূর্ণ নতুন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে হিন্দি নাট্যসাহিত্যে এই উদ্যোগ এক নতুন নাট্যভাষার সন্ধান করতে লাগল। মোহন রাকেশ এই সময়ের, বিশেষত ষাট - সত্তর দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার। সংখ্যার দিক থেকে হয়ত এই কথার সারবত্তার প্রমাণ হয় না, কারণ রাকেশজীর সর্বমোট নাটকের সংখ্যা মাত্র তিন। কিন্তু নতুন নাট্যভাষা, যা পরিবর্তিত সামাজিকতায় ভারতীয় মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের মনের নিগূঢ় পরিচয় দিতে পারে তা সৃজন করতে সক্ষম হয়েছিলেন মোহন রাকেশ।

মোহন রাকেশ তাঁর জীবদ্দশায় তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেছিলেন। নাটক তিনটি হ'ল আষাঢ় কা এক দিন (১৯৫৯), লহরোঁ কা রাজহংস (১৯৬৩), আধে আধুরে (১৯৬৯)। এছাড়া কয়েকটি একাঙ্কিকা, বেতার নাটক ইত্যাদি লিখেছিলেন তিনি। তাঁর নএকটি নাটক 'পৈর তলে কী জমিন' তিনি অসমাপ্ত জরেখে চলে যান। পরবর্তিতে তাঁর বন্ধু বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক এই নাটক সমাপ্ত করেছিলেন রাকেশের ডায়েরির পাতায় উল্লিখিত নোটের

ওপর ভিত্তি করে। নিজের সাহিত্যিক কমিটমেন্ট বা দায় সম্পর্কে মোহন রাকেশ তাঁর 'বকলম খুদ' গ্রন্থে লিখেন - ''লেখকের বাস্তবিক কমিটমেন্ট কোন বিশেষ বিচার - ভাবনার সঙ্গে না হয় নিজের সঙ্গে নিজের সময়ের সঙ্গে এবং জীবনের সঙ্গে হয়ে থাকে।''

আষাঢ় কা একদিন নাটকে আমরা দেখেছিলাম 'লেখকের অন্তদ্বর্ন্দ্ব - যা তার সৃষ্টিকর্ম ও প্রেমের পরস্পরবিরোধী অন্তর্বিরোধকে প্রকাশ করেছে', এই সংশয়ের আবর্ত অবরুদ্ধ এক নারীর যন্ত্রণাই সেখানে নাটকের মূল বিষয় হিসেবে এসেছে। অণ্যদিকে 'লহরোঁ কে রাজহংস' নাটকে আমরা পাই পারিপার্শ্বিকতার চাপে বিধ্বস্ত এক ব্যাক্তির আত্মনুসন্ধান এবং নিজের পথ বেছে নেবার অধিকারের প্রশ্নকে সামনে রাখতে। রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে দাঁড়িবে এক ব্যাক্তির সংকটের বহুমাত্রিক অভিব্যাক্তিকে ধরেছিলেন নাট্যকার। নারী - পুরুষ দুজনের অহংবোধের দ্বন্দ্ব এই নাটকে সম্পূনর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উন্মোচিত হয়েছে। এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতার বোধ নিয়ে চরিত্র দুটি দাঁড়িয়ে থাকে; যে সমস্যা একান্তভাবেই বিংশ শতাব্দীর। 'আধে আধুরে' নাটকেও সেই নিঃসঙ্গতাবোধের কথা আছে, অহংবোধের অলঙ্ঘনীয় দ্বন্দ্বের যন্ত্রণাআছে। কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা। ভেঙে পড়া সম্পর্কের, ভঙ্গুর পরিবারের আধুনিক যন্ত্রণার উপলব্ধি সব কিছুই মোহন রাকেশ উন্মোচন করেছেন। তিনটি নাটকে নারী - পুরুষের সম্পর্ক জটিলতা, তার ভাঙন তিন রকমের। 'আষাঢ় কা এক দিন' নাটকে মল্লিকা ও কালিদাসের সম্পর্ক আপাতভাবে মধুর; উভয়ের অন্তর্গত মিলও বর্তমান। কালিদাসের উন্নতির জন্য মল্লিকা তাকে রাজধানী পাঠিয়ে দিতে পিছপা হয় না। ফিরে এলে তাকে গ্রহণের জন্যও প্রস্তুত থাকে মল্লিকা। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতের তিক্ততা কালিদাসকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়। 'লহরোঁ কা রাজহংস' নাটকে নন্দ ও সুন্দরী বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব - জটিলতা তৈরি হয়েছে। উদ্বেগ, অহংবোধের সংঘর্ষ, পারস্পারিক ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা চরমে পৌঁছে গেছে। উভয়ের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দিয়েই নাটকের সমাপ্তি। তাদের এই পরাজিত, তিক্ত, পারস্পারিক বিচ্ছিন্নতা যেন কোনোভাবেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এই যেন তাদের নির্ধারিত ভবিতব্য। অন্যদিকে 'আধে আধুরে' নাটকে মহেন্দ্রনাথ ও সাবিত্রী শুধুমাত্র বিবাহিত নয় তাদের তিন সন্তান - সন্ততি বর্তমান। কিন্তু একটি বাড়ির মধ্যে সকলে থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন পরস্পরের থেকে। এই দাম্পত্যে কোনো মধুরতা নেই, আছে শুধু তিক্তার বাতাবরণ। দুই মেয়ে ও এক ছেলে তারই মধ্যে বড় হয়েছে, কিন্তু কারুর মধ্যে কোনো সংযোগের মানসিকতা তৈরি হয় নি। সাংসারিক পরিবেশ এক অভিশপ্ত অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে সকলকে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে দায়ী করে; কিন্তু কেউ যথার্থভাবে অণুসন্ধান করতে পারে না কেন এরকম হল।

মোহন রাকেশের তিনটি নাটকেই নারী চরিত্র পুরুষ চরিত্রের তুলনায় সবল। পুরুষ চরিত্র তুলনীয়ভাবে সংশয়াগ্রস্ত, দ্বিধান্বিত। কালিদাস, নন্দ ও মহেন্দ্রনাথ তিনজনই এই সত্যকে

তুলে ধরে। তিনটি নাটকেই দৃশ্যবন্ধ ব্যবহার করাহয়েছে। প্রতিভা আগরওয়াল মোহন রাকেশের নাটকের আলোচনায় বলেছেন -

> "আষাঢ় কা এক দিন নাটকের তিন অঙ্কে দীর্ঘ সময় ব্যায়িত হয়। কিন্তু 'লহরোঁ রাজহংস' নাটকে এবং 'আধে আধুরে' তে প্রায় ত্রিশ ঘন্টা ব্যায়িত হয়েছে। সময় অতিবাহিত হয়, এখানে উল্লেখ করার বিষয় হল যে, স্থান এবং সময়ে অন্বয়ের দিকে রাকেশের পূর্ণ মনোযোগ ছিল, এবং যথাসম্ভব তা টিকিয়ে রাখার প্রয়াস করেছে। মঞ্চ নির্মিত রাকেশের দৃষ্টিতে থাকত, তাই গোটা নাটকে দৃশ্য - সংযোজনা এবং ক্রিয়াকলাপ সে এমনভাবে সংযোজিত করত, যা সহজেই মঞ্চে উপস্থিত করা যেতে পারে। ..... তিনটি নাটকে দারুণ মার্জিত ভাষা এবং চোস্ত সংলাপের প্রয়োগ রাকেশ করেছে .... রাকেশ এক একটি শব্দ ওজন করে প্রয়োগ করত, ফলস্বরূপ তাঁর সংলাপে অর্থহীন শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না, কাট ছাঁটের একেবারেই বোধ হয় না। বারবার সংশোধন করার ফলে রাকেশের নাটকে কোথাও পুনরাবৃত্তি দেখা যায় না। কোনো অবস্থা বা ভাব প্রকাশের জন্য যতটা প্রয়োজন, ঠিক ততটাই বলা হয়েছে।

মোহন রাকেশের শেষ অসমাপ্ত নাটকটিতেও আধুনিক জীবনের অসঙ্গতি, অবসাদ ও দমবন্ধ করা পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে লেখা। আকস্মিক বন্যার কবলে কাশ্মীরের একটি টুরিস্ট ক্লাব জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সকলেই যেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন; নীয়তি তাদেরকে কাছাকাছি এনেছে। প্রতিটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। কয়েক ঘন্টা পর আবার সকলে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফিরে আসে। তাই নাটক কমলেশ্বর সমাপ্ত করেছিলেন। যাই হোক, মোহন রাকেশের নাটকগুলি ব্যাক্তি মানুষের চরমবিচ্ছিন্নতা ও চূড়ান্ত পরিবেশ ও সমাজবিভক্তির কথা বলে। সমাজ, পরিবার, সম্পর্ক ইত্যাদির সর্বাত্মক ছিন্নতা তাদের একাকীত্বের মাঝে নিয়ে যায়। চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিচার মোহন রাকেশের অন্যতম আগ্রহের বিষয়।

মূল নাটকের কাহিনী ও প্লট : বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

মোহন রাকেশ তাঁর 'আধে আধুরে' নাটকের সূচনায় নাটকটির চরিত্রগুলি ও তাদের মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা নিয়ে সংক্ষেপে জানিয়েছেন। যদিও এই নাটকে তেমনভাবে প্লট সুবিন্যস্ত নয়। মাত্র দুটি পর্বে নাটকটি বিভাজিত। সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক পরিচিতি থেকে জানা যায়, চারটি পুরুষ চরিত্রের অভিনয় করবেন যিনি তাঁর পরিধেয় শুধু বদলে যাবে। কালো স্যুট পরিহিত

টিপ্পনী

এই পুরুষের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি - মুখে ভদ্রতার সঙ্গে একটি পরিহাসের ভাব; জীবনসংগ্রামের বিধস্ত ও বিক্ষুব্ধ। দ্বিতীয় পুরুষ - "নিজের যা কিছু আছে তাতে তুষ্ট, তবু কোথায় যেন একটা আশঙ্কা আছে"। তৃতীয় পুরুষ সর্বদায় সিগারের টিন হাতে ঘোরে, সবসময় সিগারেট খায়; নিজেদের সুবিধাটুকু পেতেই সে আগ্রহী। চতুর্থ পুরুষটির মধ্যে একটু বয়স্কতার ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু তার সঙ্গে চাতুর্যের ভাব আছে। অর্থাৎ, মহেন্দ্রনাথ (প্রথমপুরুষ) এবং সঙ্গে তিনটি পুরুষ চরিত্র এই নাটকের কুশীলব।

মহিলা চরিত্র হিসেবে চল্লিশ বছর বয়স্ক সাবিত্রীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে - "মুখে যৌবনের চমক ও আর্তি এখনও আছে। ব্লাউজ ও শাড়ি সাদাসিধে হলে ও সুরুচিপূর্ণ। অন্য শাড়িটি বিশেষ উপলক্ষ্যের জন্য"। তার দুই কন্যা ও এক ছেলে। বড় মেয়ে বিবাহিত, বয়স কুড়ির কাছাকাছি। জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ছাপ তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে। বড় বড় পাকা পাকা কথা বলে। তার ব্যাক্তিত্বে একটা ঢিলেঢালা ভাব। আবার ছোটমেয়ে, যার বয়স বারো - তের, তার কথাবার্তায় সর্বদাই বিদ্রোহের ভাব, চালচলন অস্থিরতাপূর্ণ। একমাত্র ছেলেটির বয়স একুশের কাছাকাছি; তার মুখে সর্বদাই একটা তিক্ততার ভাব - জীবন সম্পর্কে যেন এই অল্প বয়সেই তার আশাভঙ্গতা এসে গেছে।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বৃত্তে নাটকটি বিন্যস্ত হয়েছে এই সমস্ত চরিত্রকে দিয়ে।ঘরটির বর্ণনাও দিয়েছেন নাট্যকার। ঘরটি দেখেই বোঝা যায়, একসময় গৃহস্বামীর অবস্থা ছিল খুব ভাল, কিন্তু বর্তমানে গোটা পরিবারটি যেন সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সোফা, ডাইনিং টেবিল, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি দিয়ে সাজানো ঘরটিতে অযত্নের ছাপ সুস্পষ্ট। নাটকটির দুটি পর্ব। প্রথম পর্ব সাবিত্রী, তার স্বামী মহেন্দ্রনাথ, বড়মেয়ে, ছোত মেয়ে ও ছেলেটির কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নাটকটি এগোয়। দ্বিতিয় পর্বে দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ, চতুর্থ পুরুষ এবং সাবিত্রীর সন্তানদের কথোপকথনের মাধ্যমে শেষ হয়।

অফিস থেকে ফিরে সাবিত্রী দেখে অগোছালো ঘর পড়ে আছে। ময়লা পাজামা, খাওয়া - চা এর কাপ প্লেট, একগাদা ম্যাগাজিন, বই ইত্যাদি। সেগুলি গোছাতে গোছাতেই স্বামীর কথা শুরু হয় সাবীত্রীর। সাংসারিক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কথা - কাটাকাটি চলতে থাকে। পরস্পরকে ঠেস্ দিয়ে কথা বলাটাই যেন স্বাভাবিক। যেমন, ছোট মেয়েকে দুধ খাওয়ানোর প্রসঙ্গ উঠতেই মহেন্দ্রনাথ বলে 'আমি তো ওকে এখনো চোখেই দেখি নি'। উত্তরে সাবিত্রী বলেছে, "বাড়িতে থাকলে তবে তো দেখতে পাবে"। এরকম কথোপকথনের মধ্যে জানা যায় সিংঘানিয়া আজ তাদের বাড়িতে আসবেন। সিংঘানিয়া সাবিত্রীর অফিসের বস্। এর আগেও সে দুবার এবাড়িতে এসেছে। এই আসা সহ্য করতে পারে না মহেন্দ্রনাথ - সে ওই সময় বাড়িতে থাকতে চায় না। সাবিত্রীর অফিসের খবর জিজ্ঞেস করে সে। তাতেও সাবিত্রীর

টিপ্পনী

উত্তরে ঝরে পড়ে তিক্ত বিরক্তি ও অভিমান, “তুমি সেই জন্য অপেক্ষা করে বসে আছো নাকি”। সাবিত্রী পুনরায় সুযোগ পেয়ে জুনেজার কথা তোলে। জুনেজা মহেন্দ্রনাথের বন্ধু, ব্যবসার পার্টনার। মহেন্দ্রনাথের জীবনের তার গভীর প্রভাব ; সে তার পরামর্শদাতাও ল জুনেজার কাছে ধার নেওয়া টাকা শোধ করতে পারছে না মহেন্দ্র। দুজনে মিলে ব্যবসা করতে নেমেছিল ; প্রথমবার প্রেসের ব্যবসার লোকসান হবার পর ফ্যাক্টরিতে টাকা ঢেলেছে দু'জনে যৌথভাবে । কিন্তু মহেন্দ্র লাভের মুখ দেখতে পায় নি। অভিযোগ করে সাবিত্রী। মহেন্দ্রর কথা জানা যায়, “তখন কত টাকা নিয়েছি ফ্যাক্টরি থেকে। যা টাকা লগ্নি করা হয়েছিল সে সবই তো গোড়াতেই খেয়ে ফেলা হলো আর .... জানো কত খরচ হত তখন এ বাড়িতে? চারশো টাকার বাড়ি ভাড়া ছিল, ট্যাক্সিতে যাওয়া - আসা হত, ইনস্টলমেন্টে ফ্রিজ কেনা হলো, ছেলেমেয়েরা কনভেন্টের মাইনে দেওয়া হতো ......” সাবিত্রি বলেছে, “মদ আসত , পার্টি হতো। এসবেও পয়সা খরচ হোত”। উভয়ের ঝগড়া থেকেই বোঝা যায়, পুরনো দিনের সে অবস্থা আর নেই। বাড়ির অবস্থা আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; অর্থকষ্টো পরিবারটিকে টানাপোড়নের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সবাই একসাথে তার প্রায় থাকেই না। তিন চারদিন বাড়ির বাইরে থাকে কখনো মহেন্দ্রনাথ, কখনো বড় ছেলে - কেউ কারুর খবর রাখে না। সাবিত্রী অভিযোগ করে, “তুমি যেভাবে তোমার জীবনটা নষ্ট করেছ, ও সে ভাবেই করছে”। মহেন্দ্রও বলতে ছাড়ে না যে, বড়মেয়ের স্বামীবিচ্ছিন্নতা নিয়ে। সে বলে “ আর তোমার মেয়ে? সে কার কাছ থেকে জীবন নষ্ট করার শিক্ষা পেয়েছে ? আমি তো কারুর সঙ্গে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার কথা ভাবি নি !”

সাবিত্রী বড় ছেলের জন্য একটা চাকরী জোগাড় করতে চায় সিংঘানিয়াকে ধরে। নিজের সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য সাবিত্রী তার অফিসের ক্ষমতাশালী মানুষদের সঙ্গে অতিরিক্ত সখ্যতা, তাদেরকে সময় দেওয়া, আপ্যায়ন করার কৌশলী প্রচেষ্টা নিয়ে তা মহেন্দ্র পচ্ছন্দ নয়। স্বামী হিসেবে না পচ্ছন্দ হবারই কথা। তার কথা থেকেই জানা যায়, এর আগে জগমোহন, তারপর মনোজ - এদের যাতায়াত ছিল এ বাড়ীতে। বেশ কিছু সুযোগ সুবিধাও পেয়েছে সাবিত্রী তাদের জন্যই। এসব কথাবার্তার মধ্যেই বড় মেয়ে বীণা উপস্থিত হয় বাড়ির ড্রইংরুমে। সে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, কিন্তু কেন চলে আসছে সে বারবার - এ প্রশ্ন মহেন্দ্রনাথ ও সাবিত্রী সকলের মনেই তাড়া করে ফেরে। রান্নাঘর থেকে দু' কাপ চা নিয়ে এসে অগোছালো ঘরে বসেই চলতে থাকে। বড় মেয়ে রান্নাঘর থেকে দুকাপ চা নিয়ে এসে অগোছালো ঘরে বসেই চলতে থাকে বড় মেয়ে, বাবা মহেন্দ্রনাথ ও মা সাবিত্রীর কথোপকথন। এবার আসার সময় জিনিস - পত্তর কিছুই আনে নি সাবিত্রী। ঘরে ঢুকতেই কিছু খুচরো পয়সা চায় ভাড়া মেটানোর জন্য ; তারপর চলে যায় বাথরুমে ; বলে আগে হাত মুখ ধুয়ে আসি বাথরুম থেকে। সারা গা টা এমন প্যাচপ্যাচ করছে যে ....” বাবা - মা দুজনের মনেই কৌতুহল বাড়তে

থাকে, কেন এমনভাবে চলে এল বীণা তার স্বামীর বাড়ি থেকে। মনোজের সঙ্গে তার সমস্যা ঠিক কীসের ? এই বিয়ের জন্য মহেন্দ্র ও সাবিত্রী পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে। দু'জনের কেউই বীণাকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করতে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। অনেক কথার পর অবশেষে সাবিত্রী বলে:

"মহিলা: তোকে একটা কথা সোজা জিজ্ঞেস করতে পারি?

বড় মেয়ে: নিশ্চয়ই পারো।

মহিলা: তুই ওখানে সুখী?

বড় মেয়ে: হ্যাঁ..... খুব সুখী

মহিলা: তুই সত্যিই সুখী?

....

বড় মেয়ে: (একটু বিরক্ত হয়ে) যদি বলতাম আমি সুখী নই, খুবই দুঃখী, সেটাই বোধ হয় তোমাদের মনের মত জবাব হতো?

আমার মুখ দেখে কি কি মনে হচ্ছে ? আমার যক্ষা হয়েছে ? আমি তিলে তিলে মরে যাচ্ছি? ....

মহিলা। আচ্ছা ছেড়ে দে আর কোনো দিন আমি এইসব কথা তুলবো না।

বড় মেয়ে। তুললেই বা কী লাভ ? প্রত্যেক মানুষ কোন না কোনোভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেয়।"

এরকম অপ্রত্যাশিত উত্তরের পর কীভাবে আর কথা এগোনো সম্ভব ভেবে না পেয়ে সাবিত্রী মহেন্দ্রনাথ অপ্রস্তুত হয়ে পুনরায় নিজেদের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক - বিতর্ক করতে থাকে। বীনার স্বামী মনোজের বিষয়ে কৌতুহল স্বাভাবিক ভাবেই সাবিত্রীর রয়েছে। ওর সম্পর্কে মেয়েকে জিজ্ঞেস করে সে।

"বড় মেয়ে: আমি বলতে চাই .... বিয়ের আগে মনে হত মনোজকে আমি খুব ভাল করে চিনি। কিন্তু এখন .... এখন মনে হচ্ছে সেই চেনা কোনো চেনাই নয়।

মহিলা: হুঁ....... ওর চরিত্রে এমন কিছু আছ যার জন্য ......

বড় মেয়ে। না ওর চরিত্রে এমনকিছু নেই। সেদিক থেকে ও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

মহিলা: ওর স্বভাবে এমন কিছু যে ....

বড় মেয়ে : না স্বভাবের দিক থেকে ও আর পাঁচজনের মতোই। বরং ও বেশ খোশমেজাজী।

মহিলা। তবে?

বড় মেয়ে। সেইটাই তো আমি বুঝতে পারি না। জানি না কোথায় কী একটা গলদ আছে।

মহিলা। ওর আর্থিক অবস্থা কেমন?

বড় মেয়ে। ভাল

মহিলা। স্বাস্থ্য?

বড় মেয়ে। খুব ভাল।

মহিলা। যদি কোনো কিছুতেই তোর আপত্তি নেই, তবে হয়তো কোনো বিশেষ কারণ আছে কিংবা.....

বড় মেয়ে। কারণ..... ওর আর আমার মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত হাওয়া বয়ে যায়। তার থেকেই সব।"

বীনা তার সঙ্গে মনোজের সম্পর্কের শীতলতাকে কীভাবে বোঝাবে বুঝতে পারে না। তার, রিক্ততা, নিঃস্বতা যে বাস্তব সাংসারিক চাওয়া - পাওয়ার নিরিখে নয় এটা বোঝা যায়। মনের দিক থেকে অন্তর্গতভাবে এই একাকীত্ব এসেছে। নিজের অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না বীণা; তার মনে হয় মুহূর্তে সমস্ত কিছু থেকে বেরিয়ে আসতে। মনোজ যা চায় ঠিক তার উল্টোটা করে ওর মনে ভীষণ কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে বীণার। আবার সেটা না করতে পারলেই রাগ জন্মায় নিজের প্রতি। ক্রমশ নিজের মনের আত্মবিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে থাকে বীণা। "বেশ কয়েক দিনের জন্য ওর কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিই। কিন্তুই ধীরে ধীরে সব কিছু আবার পুরনো জায়গায় ফিরে আসে। সব কিছু একইভাবে ঘটতে থাকে যতদিন না আমার আবার .... আবার নতুন করে সেই গুহার মধ্যে একবার পৌঁছে যাই"। নিজের বাড়ি ফিরে আসার কারণ বলতে গিয়ে সে নিজের হারিয়ে যাওয়া সত্তার কথাই বলতে চায়; যা সে এই বাড়ীতে ফেলে গেছে। এবাড়ীর কোন একটা জিনিসের মধ্যে সেটা নেই, কিন্তু সব মিলিয়ে এই বাড়ীর মধ্যে তা আছে। সে বলেছে, জানতে চেয়েছে নিজের মায়ের কাছে - আর সেই জানতে চাওয়ার সময় সে সর্বস্ব হারানো রিক্ত এক ব্যাক্তিত্ব -

> "বড় মেয়ে। হ্যাঁ, আমি আবার একবার সেই জিনিসটা খুঁজতে আসি যা নিয়ে ও আমাকে বারবার ছোট করে, (ভেঙে পড়ার মত অবস্থায়) তুমি বলতে পার মা সেটা কি জিনিস? কোথায় আছে সেটা? এই বাড়ির জানালায়? দরজায়? এই ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে? তোমার মধ্যে? বাবার মধ্যে? কিন্নী মধ্যে? অশোকের মধ্যে? কোথায় আছে সেই জিনিস যা ওর মতে আমি এ

টিপ্পনী

বাড়ী থেকে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে গেছি, যা আমাদের উপর ভর করে থাকে?"

নাটকটির প্রথম পর্বে বাবা-মা ও মেয়ের এই কথোপকথনে চরিত্রগুলির আত্মসঙ্কটের একটা উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বীনার এই খোঁজের সূত্র ধরে। মঞ্চে এসময় তিনটি চরিত্রই এমন কিছু অভিব্যাক্তি প্রকাশ করে যা থেকে বোঝা যায় কেউই চেনে না, এমনকী নিজেকে ও তার ভাল চেনে না- এক শূণ্যতা যেন সকলকে গ্রাস করেছে।

এরপর মঞ্চে প্রবেশ করে ছোট মেয়ে। সে স্কুল থেকে ফিরে দেখেছিল কেউ বাড়ি নেই, আর এখন দেখছে সকলেই বাড়িতে আছে কিন্তু চুপ করে রয়েছে- এমন একটা থমথমে ভাব। তার খখাবার দুধটা পর্যন্ত কেউ গরম করে রাখে নি। আ স্কুল থেকে ফেরার পথে কোথায় গিয়েছিলি জানতে চাইলে বলে, "যেখানে ইচ্ছে গিয়েছিলাম। কেউ ছিল বাড়িতে? যার কাছে থাকতাম?" তার স্কুলের বই ছিঁড়ে গেছে, স্কুলের মিস সকলের সামনে তাকে অপমান করেছে। অভিমানাহত হয়ে সে তাই বলেছ, "ছাড়িয়ে নাও আমাকে স্কুল থেকে। শোকির মত আমিও বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াব সারাদিন"। কালকে তার সুতোর বাক্স চাই- ই, সঙ্গে ফাইন্ডার্স ডে পিটি'র জন্য তিনটে নতুন কিট। তার স্কুলের জুতো মোজা পর্যন্ত কিনব বলে কিনে দেয় নি কেউ। মহেন্দ্রনাথ এর মধ্যে সিঙ্ঘানিয়ার বাড়িতে আসবার কথা জানিয়ে ঠেস দেয় সাবিত্রীকে- "আরেক নতুন লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে বাড়িতে"। টেবিলকভার পাল্টাতে গিয়ে সাবিত্রী দেখে তাও যথেষ্ট নোংরা; স্বামীর ব্যাঙ্গাত্মক কথার ইশারাতে লজ্জিত হয়ে, অভিমানে অপমানিত বোধ করে সে। ভেঙ্গে পড়ে কান্নায়; আমি আর পারি না বিন্নি। আমি আর সামলাতে পারি না"। বড় মেয়ে বীণা মায়ের পাশে দাঁড়ায়। "যবে থেকে বড় হয়েছি, এই দেখে আসছি। তুমি সব সহ্য করে এই বাড়ীর লোকের জন্য রাতদিন খেটে নিজেকে শেষ করে ফেলছ ...." বীণার কথা থেকেই পরিস্কার হয়ে যায় তাদের বাড়ির অবস্থার প্রতি কতটা দায় পালণ করেছে মহেন্দ্রনাথ। চূড়ান্ত অগোছালো এই বাড়ি; শুধু আসবাবপত্রই নয় সংসারের প্রতিটি মানুষ মনের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। কেউ কারুর প্রতি আন্তরিকভাবে সহমর্মী নয়। তবুও তাদের দিন কেটে যাচ্ছে বহুবিধ টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে।

ছোটমেয়ে বিন্নী ও দাদার চুলোচুলি থেকে জানা যায় তের বছর বয়সের মেয়ের 'বড়দের বই' পড়ে বালিশের তলায় লুকিয়ে। বাবা (প্রথম পুরুষ) বইটি দেখতে চাইলে ছেলে বলে, "এটা তোমার দেখবার মত নয়"। ক্যাসানোভার বইটি অশোক আবার পকেটের মধ্যে পুরে রাখলে আকস্মিকভাবে খুব রেগে যায় হেন্দ্র।

"প্রঃ পুরুষ: আমি কি এখানে কারো কাছ থেকে জানতে পারি, আমার বয়স কত?

টিপ্পনী

মহিলা : এমন কি বলেছি আমরা। ......

প্রঃ পুরুষ : হ্যাঁ জিজ্ঞেস করেই জানতে চাই আজ। কত বছর গেছে এই জীবনের ভার বহন করতে ? তার থেকে কত বছর গেছে এইঘর - সংসার দেখাশোনা করতে ? আর এত সব করে আজকে আমি কোথায় পৌছেছি ? এমন এক জায়গায় যেখানে সবাই আমার সঙ্গে উল্টো পাল্টা কথা বলে অভদ্রতা করে ? .... এ বাড়ীতে আমার কি এই হাল যে যে কেউ আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলতে পারে আর আমাকে সব চুপ করে সহ্য করে যেতে হবে ? সব সময় অপমান, সব সময় খোঁটা, এতদিন ধরে এই পেলাম !"

টিপ্পনী

নিজের পারিবারিক অস্তিত্ব ও সাংসারিক ভূমিকা নিয়েই সন্দিহান হয়ে পড়ে মহেন্দ্রনাথ। দিশাহীনতায় ভুগতে থাকে সে নিজেকে এই বাড়িতে একটা রবার স্ট্যাম্পের মত ভাবে। যেন যে যার অধিকার, সামাজিক মর্যাদা, সম্মান তাকে বৈধ করিয়ে নেয়। কিন্তু সাবিত্রী একথাতে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কারণ তার বক্তব্য হল, এসবের কোনোটাই সে নিজে পায় নি মহেন্দ্রর কাছ থেকে। তখন আবার ও মুখ খোলে মহেন্দ্র - "অধিকার, মর্যাদা, সম্মান এই সবই তো এবাড়ীতে এসেছে, বাইরের লোকের কাছ থেকে। আজ পর্যন্ত এ বাড়িতে যা কিছু ভাল হয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে হতে পারে - সবই বাইরের লোকের দ্বারাই হয়েছে। আমার দ্বারা আজ পর্যন্ত যা হয়েছে সব খারাপই হয়েছে, ভবিষ্যতেও তাই হবে"। স্পষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ এই উক্তিতে বোঝা যায় সাবিত্রী কীভাবে তার অফিসের বসদের খুশী করে নিজের বাড়ির বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। মহেন্দ্রর আত্মগ্লানি এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে, সে নিজেকেই ছেলের কাজ না পাওয়ার জন্য দায়ী ভাবে, একদিন রাত্রে বাড়ী থেকে তার পালানোর কারণও যেন সে নিজেই। "সত্যিই ভাবি। আমার মনে হয়, আমি একটা কীট, ভিতরে ভিতরে এই ঘরসংসার কুরে কুরে খেয়ে ফেলছি। কিন্তু এখন পেট ভরে গেছে আমার। চিরকালের মত ভরে গেছে আমার। রয়েছেই বা কি যাকে খাবার জন্যে আর থাকব এখানে ?" একথা বলে সত্যিই সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। সকলে নিশ্চুপ হয়ে দেখতে থাকে।

কিন্তু বাবার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া সন্তান ও তার স্ত্রী সাবিত্রীর ওপর কোনো প্রভাব ফলে না; কারণ এও যেন নিত্যনৈমিত্যিক ব্যাপার। তারা জানে রাত হবার আগেই ফিরে আসবে মহেন্দ্র, বরং মা ছেলেকে বলে, "তুই এখন কোথাও যাবি না। ও আবার আজকে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই"। সাবিত্রীর অফিসের বস এই দ্বিতীয় পুরুষটিকে ধরে ছেলের জন্য একটি চাকরি জোগাড় করতে বদ্ধপরিকর। শোকি পড়াশুনো শেষ করে নি। সাবিত্রী ছেলের জন্য অফিসের বসের প্রভাব খাটিয়ে ইতিপূর্ব এয়ার ফ্রিজে একটি চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তুতাও দেড় মাসের বেশী করতে পারে নি শোকি। আবার নতুন করে সেই চেষ্টাই করতে চায় সাবিত্রী। কিন্তু শোকি বিষ্ময়কর এক মানসিক অনীহায় ভোগে - যেন আশাভঙ্গ হয়েছে তার জীবনের

প্রতি; মা'র সঙ্গে তার কথোপকথনে উঠে আসে সে কথা।

"ছেলে : কেন করতে যাচ্ছ? আমি তোমাকে চেষ্টা করতে বলেছি?

বড় মেয়ে ; তুই বলতে চাস সারা জীবন কিছুই করবি না?

ছেলে : আমি কি তাই বলেছি?

বড় মেয়ে : চাকরি ছাড়া আর কি আছে যা তুই -

ছেলে : জানি না। আমি শুধু এই টুকু বলতে পারি, কাজে নিজের ভিতর থেকে কোনো উৎসাহ পাই না........

মহিলা (সাবিত্রী) : উৎসাহ তোর শুধু তিনটে ব্যাপারেই - সারাদিন ঘুমনো, ছবি কাটা, আর ঘর থেকে এটা ওটা সরিয়ে.......

ছেলে : একে ঘর বল তুমি?"

একটি যুবক ছেলের এই অপ্রত্যাশিত বিষন্নতা নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য চরিত্রগুলির সঙ্গে। মায়ের অফিসের বসকেও সে সহ্য করতে পারে না। তাকে ব্যাঙ্গ করে, তামশা উপহাস করতে চায় দিদির সামনে, মায়ের সামনে। কেমন নকল করে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে সিঙ্ঘানিয়া, কেমন অশ্লীলভাবে বসে থেকে সে অপরের বাড়ি এসে, লোকজনের দিকে তাকায় - সব কিছুই শোকির মনে চূড়ান্ত বিরক্তির উদ্রেক করে। ঘরে প্রবেশ করলে সাবত্রী সিংঘানিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় ছেলের ও মেয়ের; তারপর কথাবার্তা চলতে থাকে। ঘরে ঢুকেই ব্যস্ত মানুষের মত ঘড়ি দেখতে থাক সিংঘানিয়া, ইংরাজি পত্রিকা রীডার্স ডাইজেস্টের পাতা ওল্টায়, আমেরিকানদের সঙ্গে তার আলাপের গল্প শোনায়, কোম্পানির অন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ফলে কেমন জাপানের প্রতিনিধিদল সেদিন তার কোম্পানিতে এসে ঘুরে গেছে সে গল্প শোনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সাহিত্য সভার সম্পাদক হিসেবে কেমন কাজ করেছিলেন - সেসব কথাও প্রসঙ্গক্রমে কিছুটা অযাচিতভাবেই বলতে থাকে সিংঘানিয়া। কফি খাওয়া চলতে থাকে। তারপর সাবিত্রী ছেলের চাকরির বিষয়টা পাড়ে। কিন্তু কথা ঘুরিয়ে সিংঘানিয়া চলে যায় সাবিত্রীর শাড়ী, তার ইটালি ভ্রমণ, হরতাল, রুশ জার্মানির ঠান্ডা লড়াই, ইউনিয়ন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি প্রসঙ্গে। অশোকের একটা চাকরি করে দেবার প্রসঙ্গে কিছুই তেমন আশ্বাস দেন না সিঙংঘানিয়া; বরং স্বামীবিচ্ছিন্না বিন্নিকে তার চোখে ধরে। তখনই আকস্মিকভাবে অশোক হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, যেন তার প্যান্টের মধ্যে একটা পোকা ঢুকেছে। পোকাটিকে সে মারতে চায়। সিংঘানিয়া একে হিংসা প্রবৃত্তি হিসেবে দেখেন এবং দেশের নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতির জন্য বক্তৃতা শোনার কথা বলে বেরিয়ে যান।

পাঁচ হাজার টাকা মাসিক বেতন যার সেরকম বসকে বাড়িতে এমন ব্যঙ্গ করাটা সাবিত্রী

টিপ্পনী

কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সিংওয়ালা মানুষের ছবি সে মাকে দেখায়; লোলুপ সিংহানয়ার ব্যঙ্গচিত্রটি দেখেই সাবিত্রীর মনে পড়ে অশোকের বাবা মহেন্দ্রর কথা। শোক কিন্তু আঁকতে চেয়েছিল একটি মানুষের পোর্ট্রেট; " একটি আদিম বনমানুষ, লকলকে তার জিহ্বা, জলচুয়ানো গুহার মতো চোখ .....". সাবিত্রী বাড়িতে ডেকে এত বড় বড় লোককে ব্যাঙ্গ করাটা মন থেকে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু তার উত্তরে অশোক খুব অর্থপূর্ণ কথা বলে-

"ছেলে : তুমি আজ পর্যন্ত ডেকেছ - কী জন্য ডকেছ?

মহিলা (সাবিত্রী) : তুই বুঝিস কি জন্য ডেকেছি?

ছেলে : কোন একটা বড় জিনিসের জন্য। একজনকে ডাকলে, কারণ সে মস্ত 'ইনটেলেকচুয়াল'। দ্বিতীয় জনকে, কারণ তার মাইনে পাঁচ হাজার টাকা। তৃতীয় জনকে ডাকলে, কারণ সে চীফ্ কমিশনার। যখনই কাউকে ডেকেছ, লোকটাকে ডাক নি, হয় তার মাইনেকে, তার সুনামকে, নয়তো তার প্রতিষ্ঠাকে ডেকেছ।

মহিলা : তুই কি বলতে চাস, এইরকমের লোক এলে এই বাড়ির লোকেরা ছোট হয়ে যায়?

ছেলে : ভীষণ - ভীষণ ছোট হয়ে যায়।"

অশোকের কথায় সাবিত্রী ভীষণ মুষড়ে পড়ে। সে তো এদেরকে ধরে সংসারের উন্নতির চেষ্টাই করে গেছে। কিন্তু সেই মূল্য সংসারের কেই বা বুঝেছে? তাহলে নিজেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে কী লাভ হ'ল তার? নিজের সম্মান নিয়ে বসে থাকলেই হোত, কারুর সম্মান যেত না। ঘরসংসার চালানোর জন্য অকর্মন্য স্বামীকে মনে মনে দায়ী করে সাবিত্রী। কোনো প্রতিষ্ঠাবান লোকের বদান্যতা ছাড়া এই সংসারের বোঝা কেমনভাবে বইবে সে? কিন্তু অশোকের এই উপলব্ধি নয়; সে ভাবে কেউ যদি চালাতে না পারেন তাহলে সে চেষ্টা করেছেন কেন? দিদি ভাই এর কথাকাটাকাটিতে উঠে আসে এর আগে সাবিত্রীর কাছে যে মনোজ আসত তাকে ভালবাসার জন্যই ঘর ছেড়েছিল বীণা। সাবিত্রীর টানেই কিন্তু মনোজ প্রথম এবাড়ি এসেছিল। আজ, বড় মেয়ে বাড়ি ছেড়ে গেছে, ছোটমেয়ের শৈশব নষ্ট হয়ে গেছে, ছেলেটি বেকার ও হতাশ, স্বামী ব্যবসায় মার খেয়ে বসে পড়েছে, দায়-দায়িত্ব নেবার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। সাবিত্রী কী আর করবে .... ছেলের কাছ থেকে এমন কথা শোনার পর সে নিজেও বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে বলেছে : "আর বেশিদিন বেঁচে থাকব না। আর যে কটা দিন আছে ... আর তোমাদের চালিয়ে বেড়াব না। এই সংসারে আমার যা হবার ছিল, হয়ে গেছে এরই মধ্যে। আমার দিক থেকে এইখানেই এর শেষ ... সব শেষ।"

সাবিত্রীর এই নির্মম স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়েই নাটকের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের সূত্রপাত ঘটে এক খোলা মঞ্চে দুটি স্বতন্ত্র আলোকবৃত্তে বড় মেয়ে ও ছেলের সোফায় বসে কথাবার্তা বলার মধ্যে দিয়ে। তাদের কথায় পরিবারটি সম্পর্কগুলির ফাটল আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। মা বাড়িতে নেই, কবে কখন আসবে ঠিক নেই। মায়ের শাড়ি পড়া, তার প্ল্যান -প্রোগ্রাম সমস্ত কিছু নিয়ে তারা আলোচনা করে। সাবিত্রীর মনের এক ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য এড়ায় না। এর মধ্যে ছেলে ছোট মেয়ে বিন্নির কথাকাটাকাটিতে জানা যায় উভয়ের প্রেম সম্পর্কের টান কীভাবে সকলের অলক্ষ্যে বয়ে চলেছে। উদ্যোগ সেন্টারের বর্ণাকে ভালোবাসে অশোক। সাবত্রী ফিরে এলে বিন্নি চা করতে গিয়ে দেখে চায়ের প্যাকেট খালি। সকলে মিলে খাবে বলে চিজ্ স্যান্ডুইচ্ তৈরি করেছিল সে। কিন্তু কেউ খায় না। তখন জানা যায় সাবিত্রীর মনের কথা।

“মহিলা : আমাকে একজনের সঙ্গে বাইরে চা খেতে যেতে হবে।

বড় মেয়ে : তাহলে এখন তিনি বাইরে থাকবে না ?

মহিলা : না। জগমোহন এখনি আসবে নিয়ে যেতে।

বিন্নি তার মা’কে জুনেজাকাকুর আসার খবর দেয়। কিন্তু সাবিত্রী আমল দেয় না; এমনকী বাবা যে জগমোহনকে একদম পচ্ছন্দ করে তা জানাতেও ভোলে না বিন্নি। কিছুক্ষণ পরে জগমোহন এলে তার সঙ্গে সে কথা বলতে বাইরে চলে যায়। তৃতীয় পুরুষ জগমোহনের সঙ্গে সাবিত্রীর কথোপকথোনে উঠে আসে সাবিত্রীর মনের বিপর্যস্ত অবস্থা।

মহিলা (সাবিত্রী) - তুমি এত ভালো করে চেনো আমায় ..... এত ভালো করে। এখন আমার মনের যা অবস্থা ..... । তুমি জানো তুমি ছাড়া আমার .... তুমিই একমাত্র লোক যার উপরে আমি ...।

..... আমি ..... মনে স্থির করে ফেলেছি

তৃতীয় পুরুষ - আঁ

মহিলা - অতীতে ও হয়তো এরকম কথা আমার মুখে শুনেছ, তবে এবারে সত্যিই আমি স্থির করে ফেলেছি।”

তার সঙ্গে বাড়ি ছাড়ার প্রস্তাব বাস্তববোধসম্পন্ন জগমোহন ঠান্ডা মাথায় শীতলভাবে এড়িয়ে গেছে। সাবিত্রীকে বুঝিয়ে পুনরায় বাড়ি পাঠিয়েছে।

চতুর্থ পুরুষের প্রবেশ ঘটেছে এরপর। মহেন্দ্রনাথ বাড়ি থেকে পালিয়ে এই জুনেজার বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছে। জুনেজা তার অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু - যার ওপর সে প্রায় সমস্ত বিষয়েই নির্ভর করে, পরামর্শ করে চলে। তা নিয়ে আভিযোগ সাবিত্রীর। মহেন্দ্রনাথের ব্যাক্তিত্বের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এই জুনেজা। তাদের দাম্পত্যকেও সে বহুদিন

ধরে দেখেছে। জুনেজা বাড়িতে ঢুকে বড় মেয়ে বিন্নির মারফৎ জানতে পারে সাবিত্রী বাড়িতে নেই। বিন্নিকে সে দেখেছে ছোটবেলা থেকে। তার বাবা - মার দাম্পত্য সম্পর্কের এই অবনমন নিয়ে তার আলোচনা করতে থাকে। জুনেজাকাকুর কাছে সে জানতে পারে তার মেয়ে সুষমা ভলো আছে - সুখে ঘর সংসার করছে। বাবার শরীরের খবর নেয় সে, ব্লাড প্রেশার জনিত কারণে হার্ট - অ্যাটাক্ হয়েছে কিনা সেসব কথাও জিজ্ঞেস করে। বিন্নি বলতে থাকে তার বাবা মহেন্দ্র কীভাবে মায়ের ওপর অত্যাচার করেছে। 'আমি যখন এখানে ছিলাম, অনেক সময় মনে হতো আমি যেন একটা খাঁচার মধ্যে আছি যেখানে ...আপনি হয়তো ভাবতেও পারবেন না এ বাড়িতে কী ঘটে থাকে। ড্যাডির চিৎকার করতে করতে মায়ের কাপড় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফলা, মুখে কাপড় বেঁধে তাকে ঘর বন্ধ করে মারা .... টেনে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে কমোডের উপরে ... আমি এ বাড়িতে যেসব ভয়ানক দৃশ্য ঘটতে দেখেছি, সে আমি বর্ণনা ও করতে পারব না। বাইরের কেউ সেসব জানলে একই কথা বলত - অনেক আগেই এরা কেন ...."। তবুও জুনেজা বলে যায় মহেন্দ্র নাকি অসম্ভব ভালোবাসে সাবিত্রীকে; আর বাসে বলেই তাকে আলোচনার জন্য এবাড়িতে পাঠিয়েছে। কিন্তু জুনেজা বাড়িতে এসে জগমোহনের গাড়ি দেখেই ভেবে নেয় আর বোধহয় সম্ভব নয় এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা। এসব ভেবে জুনেজা বাড়ি থেকে বেরোতে যাবার সময় ঘরে প্রবেশ করে সাবিত্রী তার ছোটমেয়েকে বকাবকি করতে করতে। তাকে মারধর করে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। জুনেজা তাকে নিরস্ত্র করতে চাইলেও শোনে না সাবিত্রী; সে বলে - "আপনি মাঝখানে আসবেন না। .... আমার নিজের বাড়িতে কার সঙ্গে কী রকম ব্যবহারকরা উচিৎ, আপনার চেয়ে অনেক ভালো আমার জানা আছে"। জুনেজা ও সাবিত্রীর কথোপকথন এরপর বড় মেয়ের সামনেই চলতে থাকে। মহেন্দ্রর এই পরাশ্রয়ী হয়ে থাকার জন্য সে দায়ী করে জুনেজাকে।

"মহিলা - আপনি সব সময় ভাবেন আপনি ওকে খুব ভালো করে জানেন? তাই না।

চতুর্থ পুরুষ - মহেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে, হ্যাঁ। আর জানি বলেই বলছি তুমি মহেন্দ্রনাথকে এমনভাবে এক ফাঁদে বেঁধে রেখেছো যে এখনও নিজের দুপায়ে দাঁড়াতে অক্ষম।

মহিলা - নিজের দু' পায়ে! দু পা ওর ছিল কখনও?

সাবিত্রী প্রথমেই চরম উত্তেজিত অবস্থায় একপ্রস্থ নিজের কথাগুলো বলে যায়।

> "মানুষ কোন অবস্থায় সত্যিকারের মানুষ থাকে? .,.... এমনি তো যে কেউ চলাফেরা করে, কথাবার্তা বলে, সেই মানুষ। কিন্তু সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে তার নিজের মধ্যে একটা বুনিয়াদ থাকা চাই যার জোরে সে নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারে - তাই নয় কি? ... তার অকারণ যখন থেকে

আমি ওকে জেনেছি, প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির জন্যই ওকে আমি অন্যজনের ওপর নির্ভর করতে দেখেছি। বিশেষ করে আপনার উপরে। .... কিন্তু সেই ভরসার পরিণাম ? ও কোনোদিন কোন ব্যাপারে নিজেদের উপরে ভরসা রাখতে পারে নি। জীবনে সব কিছুর কষ্টিপাথর - জুনেজা।"

... ...

"একটা মানুষ ঘর বাঁধে। কেন বাঁধে ? একটা দরকার মেটাবার জন্য। কী দরকার সেটা ? নিজের ভেতর একটা .... একটা অসম্পূর্ণতাই বলতে পারেন ... তাকে ভরাট করার জন্যই। ... কিন্তু আপনার মহেন্দ্রর কাছে জীবনের অর্থ ... যেন অন্যদের খালি ছকগুলো ভরিয়ে দেওয়ার একটি উপকরণ মাত্র। অন্যেরা ওর কাছ থেকে যা আশা করে, যা চায় .... কিংবা অন্যেরা যেভাবে তাদের জিজের জীবনে ওকে ঝাটাতে পারে ...."

জুনেজার সঙ্গে যৌথভাবে প্রেসের ব্যবসায় নামা এবং লোকসান খাওয়ার কথাও বলে সাবিত্রী। নিজের অসম্ভব আত্মগ্লানির উদগীরণ ঘটতে থাকে তার কথায়।

"সেই মহেন্দ্র যে বন্ধুদের মধ্যে শুধু মৃদু হাসে, বাড়িতে এলেই বন্য জন্তু হয়ে ওঠে। জানি না কখন কাকে আঁচড়াবে,কখন কাকে ছিঁড়ে ফেলবে। আজ রেগে নিজের শার্টে আগুন লাগিয়ে দেয়। কাল সাবিত্রীর বুকের উপর বসে তার মাথা মেঝের ওপর রগড়াতে থাকে। বল বল বল আমার ইচ্ছে মত চলবে কিনা ? আমার সমস্ত কথা মেনে চলবে কি না? কিন্তু সাবিত্রী তবুও ওর কথা মত চলে না, ওর কথা মানে না। সে এই সব সহ্য করতে পারে না - একটা মানুষ এর ওমনি হয়ে যাওয়া। সে নিজের জন্য একটি সম্পূর্ণ মানুষকে চায় .... একটা .... সম্পূর্ণ মানুষ। সে চিৎকার করে এই কথাটাই বলে ।কখনো বা সে এই মানুষটাকে সেই রকম বানিয়ে নেবার চেষ্টা করে"। বাইশ বছরের দাম্পত্য জীবন সাবিত্রীর। বছর কুড়ি আগে আরও একবার এরকম কথা জুনেজার কাঁধে মাথা রেখেই সাবিত্রী বলেছিল - সেকথা মনে করিয়ে দেয় জুনেজা। বিন্নির সমানেই এসব কথায় বিচিত্র কৌণিক সম্পর্কের অতীত উঠে আসে। কম বয়সের সে কথার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে চায় সাবিত্রী। কিন্তু এবার বলতে থাকে জুনেজা। ছিঁড়ে ফালাফালা করে দেয় সাবিত্রীর ব্যাক্তিত্ব। উত্তেজিত হয়ে আলোচনা অন্যদিকে ঘোরাতে চেয়েও পারে নি সে। মহেন্দ্রকে বিবাহ করেও কেমনভাবে সাবিত্রী দু'চার বছর অন্তর কখনো জুনেজা, কখন জগমোহন, কখনো শিবাজিৎ এর মত মানুষকে জীবনে স্থান দিয়েছে। আসলে তার কাছে জীবন বলতে একসঙ্গে অনেক কিছু হয়ে,

অনেক কিছুকে জড়িয়ে বাঁচা। কোনো সম্পর্কইকেই সাবিত্রী আশ্রয় হিসেবে মেনে নিতে পারে না। এমনকী বিন্নির স্বামী মনোজকেও প্রেমিক হিসেবে আশ্রয় করতে চেয়েছিল সাবিত্রী। “মনোজের খুব নাম ছিল। সেই নামের সূত্র কোথাও পৌঁছে যাবার শেষ চেষ্টায়। কিন্তু তুমি ভীষণ ক্ষেপে গেলে যখন তুমি দেখলে সেই নামী লোক তোমার মেয়েকে নিয়ে রাতারাতি পালিয়ে গেল। অবাক বিস্ময়ে বড় মেয়ে বিন্নি শুনতে থাকে নিজের মা'র রিক্ততার কাহিনি। পুরুষের পর পুরুষের প্রতি তার আকর্ষনের অতীত ইতিহাস। বিধ্বস্ত সাবিত্রী জুনেজাকে চলে যেতে বলেও সে যায় না। আরও বলতে থাকে ; শেষবারের মত বন্ধুর জন্য আশ্রয় চাইতে থাকে সাবিত্রীর মন। এর মধ্যে ফিরে আসে মহেন্দ্র - কিন্তু সেই ফিরে আসার মধ্যে নেই কোনো আশ্রয়ের ইশারা। একটি অনিশ্চিত সম্পর্ক নিয়েই ভবিষ্যতের দিকে এগোতে থাকে রিক্ত এই পরিবারটি।

টিপ্পনী

নাটকের পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণ :

'আধে আধুরে' মোহন রাকেশের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নাটক। তাঁর নাটকে নারী-পুরুষ চরিত্রের যে মানসিক জটিলতা বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে তা নাটকে অপূর্ব মাত্রা পেয়েছে। নাটকটির ঘটনাবলী তিন ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ; যদিও সে - অর্থে এই নাটকে ঘটনার গুরুত্ব তেমনভাবে নেই। একটি পরিবারের পাঁচজন সদস্যের পারস্পারিক সম্পর্ক জটিলতাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। পরিবারের মধ্যে এমন তিক্ত সম্পর্কে দর্শক দেখতে অভ্যস্ত নয়। সাবিত্রী ও তার বড় মেয়ে বিন্নি বাদ দিয়ে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে দায়ী ও দোষারোপ করতে চায়। নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যেই তারা ছড়িয়ে দেয় এক ধরনের হতাশা ও জীবনের প্রতি নিরাসক্তির বোধ। বাড়িটির মধ্যে এমন কিছু কী আদৌ আছে যা বিন্নিকে নিজের অস্তিত্বের মধ্যে বিপন্ন করে তোলে। শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে টিকতে পারে না সে। স্বামীর সঙ্গে সহাবস্থানে আপারগ হয়ে পড়ে; মনে হয় তার বাড়িতে কিছু একটা সে ফেলে এসেছে যা তার চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসেও সে সেই বস্তুর সন্ধান পায় না। তার চরিত্রের সঙ্গে অন্তর্গতভাবে মিশে যাওয়া সেই বিষয়টি তাকে ধন্দে ফেলে দেয়। অন্যদিকে বাড়ির কারুর কাছ থেকে ভালবাসা, স্নেহ না পেয়ে ছোট মেয়ে কিন্নি হয়ে উঠেছে উশৃঙ্খল। যেখানে সেখানে এমন সব আচরণ করে যা করা উচিৎ নয়, আবার বয়সোচিত নিষিদ্ধতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

পরিবারটির পাঁচ সদস্য বাদ দিয়ে আরো কয়েকটি চরিত্র আছে যারা নাটকটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কালো স্যুট্ পরিহিত ব্যাক্তি তাদের মধ্যে অন্যতম এবং চরিত্রটি সূত্রধর

গোছের। মোহন রাকেশ এই কালো স্যুট্ পরিহিত ব্যাক্তি সম্পর্কে নিজেই জানিয়েছেন যে, এই ব্যাক্তি ও মহেন্দ্রনাথ, সিংঘানিয়া, জগমোহন, জুনেজা চরিত্রের অভিনয় যেন এক ব্যাক্তিই করেন। আসলে চরিত্রগুলির অংতর্গত ঐক্যসুত্র এভাবেই গড়ে ওঠে। এরা কেউই সম্পূর্ণ নয়; সাবিত্রীর কাছে সকলেই খন্ড খন্ড মানুষ। কালো স্যুট্ পরিহিত ব্যাক্তি নাটকের শুরুতেই এক দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাটকটির পটভূমি ব্যক্ত করে। নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যক্ত করে। সে দর্শকের উদ্দেশে বলে - 'ম্যায় নেহি জানতা, আপ কেয়া সমঝ রহে হ্যায় ম্যায় কৌন হুঁ.... পরন্তু ম্যায় আপনে মেঁ নিশ্চিত রূপ মে কুছ ভী নহী কহ সকতা'। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন কথাগুলো নাটকের শুরুতেই এক খোঁজের সন্ধান দেয়; যে খোঁজ চলতে থাকবে সমস্ত নাটকটি জুড়ে। তার আত্মানুসন্ধান ক্রমশই দর্শককের মনে চারিয়ে যেতে থাকে, যেন অনেক খন্ড ব্যাক্তির সমাহারের সামনে তারা সকলে বসে আছেন। 'ম্যায় বাস্তব মে কৌন হু? - ইয়েহ এক এয়সা সওয়াল হ্যায় জিসকা সামনা করনা ইধর আকর মৈনে ছোড় দিয়া হ্যায়'। সে বলে তার নিজের পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে - 'এক বিশেষ পরিবার উসকী বিশেষ পরিস্থিতিয়াঁ। পরিবার দুসরা হোনে সে পরিস্থিতিয়াঁ বদল জাতী। ম্যায় ওহী রহ্তা;। এরপর থেকে নাটকের দৃশ্য শুরু হয়। পরিবার, ঘর, ঘরের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন সব কিছুই যেন মানবিক সম্পোর্কের ছেঁড়া তারের বান্ডিলের মত। এই কালো স্যুট্ পরিহিত ব্যাক্তি মহেন্দ্রনাথ, স্ত্রী সাবিত্রীর সঙ্গে যার সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। সাবিত্রীর অফিসের বস সিংঘানিয়া। সাবিত্রী তার লোভের শিকার। শুধু তাই নয়, সাবিত্রীও অফিসের ক্ষমতাবানদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে বিভিন্ন পারিবারিক সুযোগ সুবিধা নেয়। সংসারের আর্থিক টানাপোড়ন থেকে বাঁচতে তাকে এসব করতে হয় এই তার বক্তব্য। এভাবেই সে সংসারের দায় পালন করে চলেছে। জগমোহন সাবিত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক - সে অভিজ্ঞ ও বাস্তববোধসম্পন্ন মানুষ। সাবিত্রীর কথা সে যত্ন করে শোনে, তার প্রতি মমত্ব আছে তার; এমন কিছু সে করে না যার ফলে সাবিত্রীর পরবর্তিতে কোনো অসুবিধা হয়। আর জুনেজা মহেন্দ্রনাথের বন্ধু; স্কুলের থেকেই সে অনেকটা আলাদা। সাবিত্রীর তার প্রতি প্রথম দিকে আকর্ষণ ছিল। এই পরিবারের সমস্ত কিছুই সে জানে। মহেন্দ্রনাথ বাড়ি থেকে পালিয়ে তার বাড়িতেই আশ্রয় নেয়। দুজনে একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করলেও মহেন্দ্রনাথ সে অংশীদারীত্ব লোকসান খায়। সেসব নিয়ে সাবিত্রীর খোঁটাও সে খেয়েছে। সকলের কাছেই তার একটা নূন্যতম বিশ্বাসের আবস্থান আছে জুনেজার। সে স্পষ্টবক্তা, পরিস্থিতি বিচার - বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তার খুব ভাল। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, জুনেজা ধৈর্য ধরে সাবিত্রীর কথা শুনেছে; তার মনের যথাযথ বিশ্লেষণও করেছে। কোনো গোপন কর্মের কথাই বাকি রাখে নি। সাবিত্রীর চরিত্রকে এনাটমির ডাক্তারের মত ছিঁড়ে ফেলেছে। দৃঢ়চেতা জুনেজার সামনে সাবিত্রী স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, তাদের পরিবারের এই

সম্পর্কগুলির বিপর্যাসের জন্য কেবলমাত্র পরিস্থিতি বা মহেন্দ্রনাথ দায়ী নয় সে নিজেও অনেকটাই দায়ী।

মোহন রাকেশ তার নাটকে চরিত্রগুলির বিশেষ নামকরণ করেন নি। কালো স্যুট্ পরিহিত ব্যাক্তি, পুরুষ এক, পুরুষ দুই, তিন, চার, বড় মেয়ে, ছেলে, ছোট মেয়ে ইত্যাদি নামকরণের মধ্যে দিয়ে যেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষই তার নাটকে উপস্থিত হয়েছে। এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখেই তার উপস্থাপিত। নাটকের ভূমিকাতেও কালো স্যুট্ পরিহিত লোকটির জবানীতে সেই ইঙ্গিত রয়েছে। পরিবারটি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে সম্পর্কগুলির টানাপোড়ন নিয়ে জটিল রূপ ধারণ করছে। আজকের সমাজব্যবস্থায় ও পরিস্থিতিতে এই চরিত্রগুলি নামবাচক নয় বরং জাতিবাচক, শ্রেণী নির্দেশক। নাটকটিতে চরিত্র উপস্থাপনের মধ্যে যে নৈর্ব্যাক্তিকতা তা দর্শকের কাছে ভীষণ আকর্ষক হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট লেখিকা প্রতিভা আগরওয়াল তাঁর রচিত মোহন রাকেশ জীবনী গ্রন্থে এই নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন -

> "গোটা নাটকের এই নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপা আমদের কাছে অদ্ভুতভাবে নিজস্ব মনে হয়। মনে হয়, এটা অন্য কারো নয় বরং আমাদেরই কথা বলা হচ্ছে। স্বামী , স্ত্রী, পিতা-মাতা, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন - নানান রূপে কোথাও না কোথাও আমরা নিজেদের ছায়া দেখতে পাই, এবং সেইসব চরিত্রের বা সম্পর্কের কথা আমাদের ঝাঁকুনি দেয়। 'আধে আধূরে'র মাঝে এটা একটা অসাধারণ শক্তি। সভ্যতা, সংস্কৃতি, সম্পর্কের অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় আবরণ। সবকিছু সরিয়ে দিয়ে নাট্যকার অত্যন্ত নির্মমভাবে তার সৃষ্ট চরিত্রের বাস্তব প্রকাশ করেছে, যা অভিনেতা ও দর্শক দুজনকেই প্রভাবিত করে, বিচলিত করে"।

মানসিক উদ্বেগ নাটকটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নাটকের সময়কাল প্রায় ত্রিশ ঘন্টা। প্রথমদিকে সিংঘানিয়া ও জগমোহন অংশ বাদ দিলে প্রায় পুরোটাই মানসিক উদ্বেগের বর্ণমালা। এই মানসিক উদ্বেগকে সচেতনভাবে নাট্যকার জিইয়ে রাখেন। শুরুতে দেখা যায়, সাবিত্রী অফিস থেকে ফিরে একটি অগোছালো ঘরে - যা প্রতীকী। কিছুক্ষণ পর ঘরে আসে মহেন্দ্রনাথ; অগোছালো ঘরেই শুরু হয় তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি। তাদের সম্পর্কের ভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতঃপর ঘরে প্রবেশ করে বড় মেয়ে; তার কথা থেকে জানা স্বামীকে ছেড়ে সে চলে এসেছে। আবার একটা সম্পর্ক ভাঙনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে দর্শকের। এরপর বড়ছেলে, তার সঙ্গে সাবিত্রীর কথা কাটাকাটি তুঙ্গে ওঠে। মহেন্দ্রনাথ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সাবিত্রী তার ছেলে অশোকের একটা চাকরি জোটানোর জন্য অফিসের বস সিংঘানিয়াকে বাড়িতে

ডাকলে অশোকের সঙ্গে তার তর্কাতর্কি শুরু হয় যা সাবিত্রীর পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক। সাবিত্রী চূড়ান্ত অপমানিত ও হতাশ অবস্থায় জগমোহনকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বিন্নিকে বলেছে পরের বার এসে সে তাকে বাড়িতে নাও দেখতে পেতে পারে। বিন্নি তাকে আরেকটু ভবতে বলে;ই কিন্তু সাবিত্রী আর ভাবতে চায় না। জগমোহনের সঙ্গে সে চলে যায়। মোহন রাকেশের তিনটি নাটকেই তাঁর নারী চরিত্রগুলি খুব স্পষ্ট ও বলিষ্ট ; ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ও তারা নিজেরা যা ভাবে তাই করতে চায়। এখানে সাবিত্রীর ক্রিয়াকর্মের নৈতিকতা ও তার সাংসারিক দায়ের থেকেও বড় হয়ে ওঠে তার ভাবনা অনুযায়ী কাজ করার একমুখী দৃপ্ত ভাব। ভেতরে ভেতরে শতচ্ছিন্ন মানসিক জটিলতায় খণ্ডিত মানুষটিও নিজের কাজের জন্য কেমনভাবে যুক্তি তৈরি করে নেয় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাটকটিতে। জগমোহনের কাছ থেকে কোনোরকম ভরসা ও স্থায়ী আশ্রয়ের নিশ্চয়তা না পেয়ে সে যখন ফিরে আসে তখন সে খুব উৎকেন্দ্রিক আচরণ করে। কিন্নিকে বকাবকি করে মারে তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দেয়, এবং জুনেজার সঙ্গে তর্কাতর্কিতে নেমে পড়ে। প্রথমে জুনেজাকে যথেষ্ট অপমান করেছে সে কিন্তু ধৈর্য্যের সঙ্ঘাতের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ ফিরে আসে বাড়িতে। আসলে ফিরে আসার মধ্যে কোনো সম্পর্ক উন্নয়নের আশা সঞ্চারিত হয় না; বরং আরও অন্ধকারময় মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পটভূমি তৈরি হতে থাকে বাড়িটি। যেন এক অসুস্থ মানসিক সম্পর্কের এসাইল্যাম। নাগরিকতার মধ্যে সেই সম্পর্কভাঙ্গনের অতিরেকগুলি নিজেকে উন্মোচন করে দাঁড়িয়ে আছে। পারিবারিক সম্পর্ক ভাঙনের মুখ্যব্যাদানই নাটকটির শিল্পরূপ।

নাগরিক জীবনের মধ্যে যে পৌনপুনিকতা, ক্লান্তি, হতাশা ও আত্মসমর্পনের জটিলতা থাকে তা খুব ভালো করে উপলব্ধি করেছিলেন মোহন রাকেশ। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের ভঙ্গুরতাকে তিনি নাটকের বিষয় করেছিলেন। সেই বোধের ওপর দাঁড়িয়ে। সাবিত্রী, মহেন্দ্রনাথের পরিবার এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ফোকাস হলেও, যেন মনে হয় তারা নির্দিষ্ট কোনো সামাজিক প্যাটার্ণের প্রতিনিধিত্ব করছে। এমন একটা সমাজ যেখানে পরিস্থিতি পরিবেশ মানবিক সম্পর্কগুলিকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে সুখ, আত্মতৃপ্তি অথবা ব্যাক্তিগত স্বার্থের অলীক স্বপ্ন দেখিয়ে একটা সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতার সূত্র যেন ক্রিয়াশীল থাকছে নেপথ্যে। সেই বিচ্ছিন্নতার বোধ সামাজিক অধিমানসে যেমন আছে তেমনই অনুস্যুত হয়ে আছে ব্যাক্তিক মানসিকতার স্তরে।

মোহন রাকেশের ব্যাক্তিগত দিনলিপির পাতা ওল্টালেই স্পষ্ট হয় কীভাবে একাকীত্বের বোধ তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। সেই বিচ্ছিন্নতার বোধ রাকেশের উপস্থাপিত চরিত্রগুলিত মধ্যে অনুষ্যুত হয়ে আছে।

"আমি শুধু চিন্তা করি।

মনে হয় জীবনে কোনো রং নেই, স্বাদ নেই - প্রতিটি ব্যাপার পানসে - আমার লেখা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ?" (১৮.০১.১৯৫৯)

> "আমার সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা এই যে আমি যাকে বিশ্বাস করি তাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। বহুবার ইচ্ছে করে, নিজের সবকিছু সকলকে বলে দিই - প্রতিটি লেখক প্রতিটি লোকের সামনে নিজের কনফেশন্ করি"। (০৬.০৯.১৯৫৮)

টিপ্পনী

জীবন সম্পর্কে আরো কিছু ভাবনার আমাদের নজর টানে তাঁর আত্মজীবনীর পাতায়। এই নাটকের চরিত্রদের স্বগতোক্তি, কনফেশ্ন উপলব্ধিতে সেসব কথাগুলি সাহায্য করে। "একাকীত্ব ! একটা অভিশাপও হতে পারে, একটা আকাঙ্ক্ষা, আবর্তনও হতে পারে, প্রত্যাবর্তনও। বিচ্ছিন্ন হতে পারে, যুক্ত থাকার অন্তরালও"। .....

> "ব্যাক্তি অনিবার্যরূপে একা, হ্যাঁ - একা। কিন্তু এই একাকীত্ব যে অসামাজিক বা সমাজবিরোধীই হবে, এমন নয়। সামাজিক হওয়াতেই তো তার একাকীত্বের বোধ আছে, তা থেকেই একাকীত্বের প্রয়োজনও .. । .. একাকীত্বের প্রয়োজন অনুভূত হয় এজন্য যাতে দোকা হোয়ার নির্দিষ্ট ভূমি প্রস্তুত হয়। যে একাকীত্ব একা থাকার সীমারেখায় আটকে যায় তাতো মৃত্যুর সামিল। বেঁচে থাকার শুরুই একাকীত্ব থেকে, তা দ্বিতীয় ব্যাক্তি কাছে হলেও"। (০৮.০৮.১৯৬৪)

এই নাটকের সাবিত্রী মহেন্দ্র ও বড় মেয়ে বিন্নির যে মানসিক সংকট ও একাকীত্বের সমস্যা জীবনের সব কিছু হারিয়ে ফেলার সমস্যা, অর্থহীন জীবনকে বয়ে বেড়াবার দায় - সমস্ত কিছুই এই আত্মোপলব্ধির ওপর দাঁড়িয়ে বুঝতে সুবিধে হয়।

নাটকের সংলাপ ও ভাষা :

মোহন রাকেশের নাটকের ভাষা ও সংলাপ খুব স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। মাত্র তিনটি নাটক তিনি রচনা করেছন ; কিন্তু তিনটিতেই তাঁর ঋজু বাগভঙ্গি ও নির্মেদ বাক্য বিন্যাসে সজ্জিত সংলাপ দর্শককে আকর্ষণ করেছে। তাঁর সংলাপগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সেগুলির যথার্থ, পরিমিতবোধ এবং প্রত্যক্ষতা। যেহেতু সম্পর্কের ভাঙন ও তার বিপযার্স তাঁর নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই তাঁর নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি সংলাপ এই মানসিক সংঘটনকে তুললে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। সঠিক মনোভাব ব্যাক্ত করার জন্য সঠিক শব্দচয়ন রাকেশের রচনাশৈলীর বিশেষত্ব। দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা যে এত সবলভাবে নাট্যভাষাকে প্রভাবিত করতে পারে তা সচরাচর দেখা যায় না। বাক্যের স্বাভাবিক গঠনগত বিপর্যাসও বেশ কিছু ক্ষেত্রে

পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সেই বিপর্যাস এতটাই প্রত্যক্ষতা আনে চরিত্রগুলির রূপায়নে যে তা জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁর নাটকের অনূদিত পাঠেও সেই টান পরিলক্ষিত হয়।

তাঁর নাটকটির যে বাংলা অনুবাদের পাঠ সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেখান থেকে কয়েকটি উদাহরণ নেয়ে বিষয়টি দেখা যেতে পারে।

প্রথমপর্বে সাবিত্রী অফিস থেকে ঘর ঢুকেই দেখতে পায় অগোছালো ঘর।

"মহিলা - (ক্লান্তভাবে) আ ... হ্. (একটুর হতাশার সুরে) আজও কেউ নেই বাড়িতে (ভেতরের দিকে তাকিয়ে) কিন্নি ...। উত্তর দেবে কে ... থাকলে তবে তো ....। আবার ছিঁড়ে এনেছে এটা বই। এতটুকু লজ্জা নেই , একবার ভাববে না কোত্থেকে রোজ - রোজ নতুন বই কেনার পয়সা আসে ....।....

সারাদিন বাড়িতে থেকে আর কিছু না করলেও, নিজের জামাকাপড়টা তো গুছিয়ে রাখতে পারে। ... চা খেয়ে বাসনগুলো রান্নাঘরে তুলে রেখে আসতে পারে না। আমি এসে তুললে উঠবে।"

বড় মেয়ে তার স্বামীকে ছেড়ে বাড়ি ফিরে এলে মা - বাবার সঙ্গে তার কথোপকথনটিও অসাধরণ নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাবিত্রী, মহেন্দ্র এবং বড় মেয়ের চরিত্রের মধ্যে যে অপরিজ্ঞাত নৈর্ব্যক্তিকতা বর্তমান তার ইশারা সংলাপগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই যেন এক গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে খুঁজে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো হারিয়ে যাওয়া সূত্র।

"মহিলা - তুই ওখানে সুখী?

বড় মেয়ে - হ্যাঁ ... খুব সুখী।

মহিলা - তুই সত্যিই সুখী।

বড় মেয়ে - তা নয় তো কি এমনিই বলছি?

প্রথম পুরুষ - এটা কোনো জবাব হলো না।

বড় মেয়ে - (একটু বিরক্ত হয়ে) যদি বলতাম আমি সুখী নই, খুবই দুঃখী, এটাই বোধহয় তোমাদের মনের মত জবাব হতো?

প্রথম পুরুষ - মুখের কথা ও মুখের ভাবের মধ্যে সঙ্গতি থাকবে তো!

বড় মেয়ে - আমার মুখ দেখে কি মনে হচ্ছে? আমার যক্ষ্মা হয়েছে হয়েছে? আমি তিলে তিলে মরে যাচ্ছি?

প্রথম পুরুষ - যক্ষ্মা ছাড়া আর কিছু হয় না বুঝি?

বড় মেয়ে - আর কি হয়? চোখের আলো নষ্ট হয়ে যায়? নাক - কান বিষাক্ত হয়ে

টিপ্পনী

যায়? ঠোঁট দুটো খসে পড়ে যায়? আমার মুখ দেখে আর কী মনে হয় তোমাদের?

যখন স্বামী মনোজের সঙ্গে তার সম্পর্কের ও ছানবিন আরও গভীরভাবে করার প্রচেষ্টা করতে থাকে সাবিত্রী তখন বড় মেয়ে বিন্নির সংলাপে উঠে আসে তার মনস্তাত্ত্বিক ভাষ্য। সে বলে - "ওর মনে খুব দুঃখ দিতে পারি। ও আমার লম্বা চুল ভালোবাসে .... সেইজন্য ইচ্ছে হয় চুলগুলো কেটে ফেলি। ও চায় না যে আমি চাকরি করি, তাই ইচ্ছে করে, ছোট যে কোনো রকমের যা পাই, একটা চাকরি জুটিয়ে নিই। এমন কিছু যাতে অন্তত একবার ওকে প্রচন্ড চটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু করতে কিছুই পারি না। আর যখন কিছুই পারি না তখন নিজের উপরে রেগে উঠি"। বেশ উপলব্ধি করা যায় মনের জটিলতা ও বিপর্যাস সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এখানে।

অন্যদিকে মহেন্দ্রনাথের সংলাপে পরিস্ফুট হয় তার চরিত্রের অন্তদ্বন্দ্ব। পরিবারের মধ্যে কেউ তার কথা শোনে না, সাবিত্রী তাকে দায়ী করে পরিবারের এই ভয়ানক দুরাবস্থা ও ছন্নছাড়া ভাবের জন্য। স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তায় উঠে আসে এমন কিছু মুহূর্ত।

"প্রথম পুরুষ - আমি শুধু এইটুকুই জানতে চাই এ বাড়িতে আমার এই হাল যে, যে কেউ আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলতে পারে আর আমাকে সব চুপ করে সহ্য করে যেতে হবে? সব সময় অপমান, সব সময় খোঁটা, এতদিন ধরে এইই পেলাম!

মহিলা - কাকে শোনাচ্ছে এইসব কথা?

প্রথম পুরুষ - কাকে শোনাতে পারি? কেউ আছে যে শুনবে? যাদের শোনা উচিৎ তারা তো আমাকে ওএকটা রবার স্ট্যাম্পের চেয়ে বেশি কিছু মনে করে না।"

মহেন্দ্রনাথের সংলাপে উঠে তার মনের অন্তর্গহনে যে ঝড় চলছে তার পরিচয়।

"নিজের জীবন নষ্ট করবার জন্য আমি দায়ী ... তোমার জীবন নষ্ট করবার জন্য আমি দায়ী। তবুও এই বাড়ীর সঙ্গে আমি সেঁটে রয়েছি, কেননা আমি আরাম পচ্ছন্দ করি, আমি ঘরকুনো, আমার হাড়গোলোতে মর্চে ধরছে। ....

সত্যিই ভাবি। আমার মনে হয় আমি একটা কীট, ভিতরে ভিতরে এই ঘরসংসার কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছি। কিন্তু এখন পেট ভরে গেছে আমার। চিরকালের মত ভরে গেছে। রয়েছেই বা কি যাকে খাবার জন্য আর এখানে থাকবো"।

আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্বগোতোক্তিময় স্বীকারোক্তির ভয়াবহ সুর এখানে যেভাবে ধ্বণিত তা দর্শকের মনকে স্পর্শ করে। ভাঙনের সুরলিপিটি যেন একটা চরিত্র, গোটা পরিবারকে গিলে ফেলতে চায়।

প্রথম অঙ্কের শেষে সাবিত্রীর সঙ্গে তার ছেলে ও বড় মেয়ের কথাবার্তায় দেখা যায় আরেকটি আত্মউন্মোচন। বাড়িতে লোক ডাকা নিয়ে মা'কে ছেলে স্পষ্ট প্রশ্ন করেছে এবং সেই

অনিভিপ্রেত বিষয়গুলি এভাবে সামনা - সামনি কথাবার্তায় তুলে ধরার বলিষ্ঠ কৌশল নিয়েছেন নাট্যকার। অফিসের বসকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘরে নিয়ে এলে ছেলে তাকে ব্যঙ্গ ছবি এঁকেছে, দুর্ব্যবহার করেছে - সেই পরিপ্রেক্ষিতে কথা হচ্ছে দুজনের,

"মহিলা - .... কিন্তু আমি অনেক অনুরোধ করে খোসামোদ করে লোকদের বাড়িতে ডাকি আর তুই ঠাট্টা করিস, ওদের কার্টুন আঁকিস আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না .....।

ছেলে - যদি সহ্য করতে না পার, তাহলে এমন লোকেদের কেন ডাক, যারা বাড়িতে এলে -

মহিলা - হ্যাঁ হ্যাঁ বল না যারা বাড়িতে এলে কী হয়?

ছেলে - থাক্। আমি এই জন্যই চলে যেতে চাইছিলাম।

মহিলা - তুই আগে তোর কথাটা শেষ কর।

ছেলে - যারা এলে আমরা এমনিতেই যত ছোট তার চেয়েও ছোট মনে হয় নিজেদের। "

এভাবেই তর্কাতর্কি চলতে চলতে সাবিত্রীর মনের গহন অন্ধকার থেকে বিষ্ফোরণ ঘটে। সে বলে -

> "ডাকি, যাতে এ বাড়ির একটা কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। ডাকি কেন না আমার একার উপরে পুরো ঘরসংসারের বোঝা; ডাকি যাতে আর কেউ একজন আমার সঙ্গে সেই দায়িত্ব বইতে পারে। আমি যখনই কোনো প্রতিষ্ঠাবান লোকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করি সেটাও আমার জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য। কিন্তু তোমরা যদি এতে নিজেদের ছোট মনে করো তাহলে এসব চেষ্টা আমি ছেড়ে দেব। তবে জেনে রেখো, আমি একা এই সংসারের দায়িত্ব চিরকাল বইতে পারব না"।

দ্বিতীয় অঙ্কেও দেখা যায় এমন কিছু সংলাপ যা ওই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের সামনে উচ্চারিত হয়েছে, তাদের মনের গহন অন্তলোর্ককে প্রকাশ করেছে। যেমন চতুর্থ পুরুষের সঙ্গে বড় মেয়ের কথোপকথনে বিন্নি বলেছে -

> "এতো সহজে উড়িয়ে দেবার কথা নয় কাকু। আমি যখন এখানে ছিলাম, অনেক সময় মনে হতো আমি যেন একটা খাঁচার মধ্যে আছি যেখানে ... আপনি হয়তো ভাবতেও পারবেন না এবাড়িতে কী ঘটে থাকে"।

বড় মেয়ে - কাকু!

টিপ্পনী

চতুর্থ পুরুষ - (আবার থেমে) হ্যাঁ মা।

বড় মেয়ে - সত্যিই কিছু হতে পারে না আর?

চতুর্থ পুরুষ - একদিনে জন্য হতে পারে, দুদিনের জন্যও হয়তো হতে পারে। কিন্তু চিরদিনের জন্য ....”

এসব সংলাপের ভাষা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনই চরিত্রের অন্তঃকরণ স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করে। একটি মাত্র ঘরে ঘটতে থাকা ঘটনাকে শুধুমাত্র সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। স্বগতোক্তি অথবা মনস্তাত্ত্বিক বয়ানের ক্ষেত্রে মোহন রাকেশের সংলাপ খুব সংবেদী ও যথাযথ; আবেগের অতিরেক সে সংলাপকে স্পর্শ করে না। নাট্যকার নিজেই নাটকের মধ্যে লিখে রাখেন কেমন দৈহিক আচার-আচরণ করতে করতে চরিত্রটি কথা বলবে, কেমন হবে তার অঙ্গভঙ্গি। চরিত্রগুলির এই আচরণগুলিও সংলাপের কথা বলে।

টিপ্পনী

প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

১. আধে - আধুরে নাটকটিকে কী একটি এবসার্ড নাটক বলা যায়? আলোচনা করো?

২. আধে - আধুরে নাটকটিচর পাত্রপাত্রীদের সম্পর্কে নাট্যকার যে টীকা যোগ করেছেন তা সম্পর্কে আলোচনা করে দেখাও সেটি নাটকটির মূল ভাবার্থকে উপব্ধি করতে কতটা সাহায্য করে।

৩. আধে - আধুরে নাটকের মধ্যে যে পরিবারটির ছবি আছে তার পরিচয় দাও।

৪. আধে আধুরে নাটকতির চরিত্রগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উপস্থাপন করুন।

৫. আপাতভাবে সুসংবদ্ধ কাহিনী না থাকলেও চরিত্রগুলির মানসিকতা বিশ্লেষণে বিভিন্ন ঘটনা নেপথ্যে সংলাপের মধ্যে উঠে এসেছে - আলোচনা করো।

৬. ‘আধে - আধুরে; নাটকটির গঠন সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭. মোহন রাকেশের নাট্যকৃতির পরিচয় দাও।

৮. ‘আধে আধুরে’ নাটকে চরিত্রের খন্ডীভবন কেমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে আলোচনা করো।

৯. চারজন পুরুষের চরিত্রে একজন অভিনেতার উপস্থাপন ‘আধে আধুরে’ নাটকে কেমনভাবে শিল্পিত হয়ে উঠেছে আলোচনা করো।

১০. ‘আধে আধুরে’ নাটকের সাবিত্রী চরিত্রটি সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করো।

একক -৪ :ইন্দিরা গোস্বামীর গল্প

ইন্দিরা গোস্বামী আধুনিক সাহিত্যের একজন অন্যতম খ্যাতিমান লেখিকা। আধুনিক অসমীয়া জনমানসে তাঁর ট্র্যাজিক জীবন ও লেখনী মৃত্যুর পরও আলোচনার বিষয় হয়ে আছে। অসমীয়া ইতিহাস ও জনজীবনের গভীর পরিচয়কে ভারতবর্ষের আধুনিক কথাসাহিত্যে জায়গা করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর সংবেদনশীল মন, গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে এসে মিলেছে নারী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ লড়াই। ব্যাক্তিগত জীবনের সম্পর্ক, টানাপোড়েন, ট্র্যাজেডিকে যেমন অবলীলায় তিনি সাহিত্যের উপাদানে পরিণত করেছেন তা আধুনিক ভারতীয় কথাকারদের মধ্যে বিরল। 'ন্যাশানাল বুক স্ট্রাস্ট' প্রকাশিত 'মাস্টারপিস্ অব ইন্ডিয়ান লিটারেচার' গ্রন্থে তাঁকে সমকালীন অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মামনি রায়সম গোস্বামী ছিল তার আসল নাম।

টিপ্পনী

ইন্দিরা গোস্বামীর জীবন ও সাহিত্যকর্ম :

লেখিকা হিসেবে তাঁর সৃজনশীলতার পিছনে যে সংবেদনশীল মন ও মনন কাজ করেছে তা উপলব্ধি করতে গেলে ইন্দিরা গোস্বামীর জীবনের পাতাগুলির দিকে চোখ ফেরাতে হবে। ১৯৪২ সালে দক্ষিণ কামরূপের আমরাঙা সূত্রের অন্তর্গত গড়াইমারীতে এক সত্রাধিকার পরিবারে জন্ম হয় মামণি গোস্বামীর। পরবর্তীতে ভূমিকম্পে গড়াইমারী সূত্রটি বিনষ্ট হলে জামবরিতে ও তারও পরে আমরাঙা সত্রে উঠে আসেন তাঁর পূর্বপুরুষ। এগুলি ছিল ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের কনৌজ থেকে প্রায় ৪৭০ বছর পূর্বে তাঁর পুর্বপপুরুষেরা এখানে এসেছিলেন বৈষ্ণব সাধক শ্রীশান্তদেবের হাত ধরে। ইন্দিরা দেবীর পিতা শ্রীযুক্ত উমাকান্ত গোস্বামী ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ। স্কুলশিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষায় তিনি বহুবার স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন, সর্বোপরি ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে করোনেশন মেমোরিয়াল পদকে ভূষিত করেছিল। সরকারী দপ্তরের উচ্চপদে চাকরি করেন তিনি এমনকী অবিভক্ত অসম প্রদেশের 'ডিরেক্টর অব প্লাবিক ইন্সাট্রাকশন' (ডি পি আই) পদেও বৃত হন তিনি। সাইমন কমিশনের সামনে তিনি অসম প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইন্দিরা দেবীর মাতা শ্রীযুক্তা অম্বিকা দেবী ছিলেন অহম প্রদেশের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব কৃষ্ণনাথ ফুকন বরতামুলির দূরসম্পর্কীয় বংশধর। স্বামী ব্যস্ত থাকায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে সময় দিতেন তিনি। সত্রাধিকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ইন্দিরা দেবীর মাতা কখনোই

নিজের আত্মজাকে অন্য সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মিশতে বা খেলাধুলো করতে বাধা দেন নি।

ইন্দিরা দেবীর শৈশব কেটেছিল মূলত আমরাঙা গ্রাম, শিলঙ ও গৌহাটিতে। তাঁর এই ছোটবেলার আনন্দময় দিনগুলির স্মৃতিকথা ভিড় করে আছে তাঁর পরবর্তী লেখাগুলিতে। আমরাঙা গ্রামের আত্মীয়স্বজন, সঙ্গীসাথী, হাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব, শিলং এর মিশনারী শিক্ষার স্কুল, পর্বতঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করে রেখেছিল। তাঁর সংবেদনশীল মনে এই শৈশবেদর গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু আনন্দই নয় জীবনের অন্ধকার, একাকীত্ব, দুঃখের অভিজ্ঞতাও তাঁর শুরু হয়েছিল এই শৈশব অবস্থায়। শিলং - এ থাকাকালীন তো ক্রিনোলিন ফলস্ এ আত্মহত্যার ও চেষ্টা করেছিলেন তিনি। জীবনের এই আনন্দ ও অন্ধকার যুগপৎ তাঁর সহিত্যে জায়গা করে নিয়েছিল।

১৯৫০ সালে উমাকান্ত বড়ুয়া অবিভক্ত অসমের ডি পি আই হলে তৎকালীন রাজ্যের রাজধানী শিলং স্থানান্তরিত হয় তাঁর পরিবার। মামনি ভর্তি হন পাইন মাউন্ট স্কুলে। ছোটবেলা থেকেই তাঁর আঁকায় আগ্রহ ছিল। এখানকার প্রকৃতি সেই সংবেদনাকে আরও বাড়িয়ে তুলল। ১৯৫৪ সালে উমাকান্ত বড়ুয়া চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর গৌহাটিতে পরিবার সহ চলে আসেন। মামণিকে ভর্তি করা হয় টি সি গার্লস হাই স্কুলে। ১৯৫৫ সালে মামণি'র পিতা উমাকান্ত বড়ুয়া ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সেবছর 'নতুন অহমীয়া' সংবাদপত্রে ইন্দিরা গোসবামীর প্রথম দিকের গল্পগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। এগুলির অধিকাংশই ইংরাজি থেকে অনূদিত গল্প। টি সি হাইস্কুলে পাঠকালীন ইন্দিরা ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদিকা হয়ছিলেন। এমসয় গোয়ার মুক্তিযুদ্ধের সর্থনে সুবিশাল জনসমাবেশে স্কুলের প্রতিনিধি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাজস্থানের জয়পুরেও তিনি এসময় ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব করতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এসব কর্মসূচী তাঁর দৃষ্টির প্রসারতা বাড়িয়েছিল সন্দেহ নেই। ১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিকেলেশন পরীক্ষা পাশ করে তিনি হান্ডিক গার্লস কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৬০ সালে তিনি গৌহাটির কটন কলেজে ভর্তি হন গ্রাজুয়েশনের জন্য। ইতিমধ্যে তিনি লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেছেন।তাঁর রেড়িও নাটক 'বনহংসী' গৌহাটি রেডিও স্টেশন থেকে সম্প্রচারিত হয়। অসমে এসময়ে ভাষা আন্দোলনের আগুণ ছড়িয়ে পড়েছিল। কটন কলেজের প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছিল এক যুদ্ধক্ষেত্র। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান রণজিৎ বারপুজারী। ইন্দিরা গোস্বামী অসুস্থদের দেখতে হাসপাতালে যান। এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও আন্দোলনকারীদের প্রতি এক ধরনের মানসিক সংলগ্নতার বোধ ছিল যা তার লেখনিতেও বারবার ফিরে এসেছে।

ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন 'মানসিক ডিপ্রেশনের' শিকার; পিতার মৃত্যুর পর তা বেড়েছিল। ১৯৬০ সালে তাঁর কাকা চন্দ্রকান্ত বড়ুয়ার আকস্মিক মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি

টিপ্পনী

ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হন। আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়তে থাকে ; ফলে চিকিৎসা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৬১ সালে তিনি অসমীয় সাহিত্যের স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমে ভর্তি হন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবছর বিশ্ববিদ্যালয় জার্ণালে প্রকাশিত হয় 'সে আঁধার পুহারারু অধিক' এবং উচ্চ - প্রশংসিত হয়। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'চিনাকি মরম'; প্রকাশক লয়ার্হ্ বুক স্টল। ১৯৬৩ সালে তিনি কিছুদিনের জন্য গৌহাটির সেন্ট মেরীজ্ হাইস্কুলে পড়িয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। ১৯৬৫ সালে বাড়ির অমতে তিনি বিবাহ করেন এক কর্ণাটকী ইঞ্জিনীয়ার মাধবন রায়সম আয়েঙ্গারকে।

বিবাহের পর মাধবনের সঙ্গে কচ্ছের রণে যান স্বামীর পেশাগত কাজের জন্য। কাজের জন্য উদ্বাসিত নির্মাণকর্মীদের জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা হয়েছিল এখানে। যা পরবর্তিকালে তাঁর লেখার বিষয় হয়েছে। ১৯৬৬ সালে মাধবন চেনাবর ব্রিজ প্রজেক্টের কাজে স্থানান্তরিত হন জন্মু - কাশ্মীরে। স্বামীর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীও গিয়েছিলেন চেনাবর নদী তূরবর্তী সেই স্থানে। এখানেই তিনিই তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'চেনাবর স্রোত' লিকেছিলেন ১৯৬৬ সালে। পরের বছর ১৫ই এপ্রিল এক আকস্মিক জিপ এক্সিডেন্টে মাধবনের মৃত্যু হয়। উধমপুরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে স্বামীকে হারিয়ে বিপর্যস্ত ইন্দিরা দেবী ফিরে আসেন গৌহাটি এবং শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন গোয়ালপাড়া সৈনিক স্কুলে। ১৯৬৮ সালে তিনি বৃন্দাবন যান 'ইনস্টিট্যুট্ অব ওরিয়েন্টাল ফিলোসফি' তে গবেষণার জন্য; অধ্যাপক উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু ছিলেন তাঁর গবেষণা নির্দেশক। তাঁর গবেষণায় বিষয় ছিল মাধব কান্ডালি'র রামায়ন ও তুলসীদাসী রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা। ১৯৭০ সালে 'আসাম বাণী'র বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ পায় তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'নীলকন্ঠ ব্রজ'। উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল বৃন্দাবনের বিধবাদের মর্মান্তিক জীবনসংগ্রামের দিনলিপি নিয়ে।

১৯৭১ সালে ইন্দিরা গোস্বামী যোগদান করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ; তখনও তিনি গবেষণার কাজ সমাপ্ত করতে পারেন নি। ১৯৭৩ সালে তিনি পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি মুন্সী প্রেমচন্দ্রের গল্প অনুবাদ করেন হিন্দি থেকে অসমীয়া ভাষায়, যা 'ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট' প্রকাশ করেছিল। ১৯৭৬ সালে সাউথ এশিয়ান দেশগুলিতে বিভিন্ন সেমিনার কাজে ভ্রমণ করেন। ১৯৭৮ সালে মালয়লম উপন্যাস আমাশিকা নীরম্' অণুবাদ কেন আসমীয়া ভাষায়। রাময়ণ বিষয়ক বহু বক্তৃতা এসময়ে ইন্দিরা গোস্বামী করেছিলেন। এরপর থেকে তাঁর লেখার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশে বিদেশে। প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক উপন্যাস ও ছোটগল্প। যার তালিকা দেওয়া হল পৃথকভাবে।

লেখালেখি ছাড়া তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল আলফা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে

টিপ্পনী

সরকারী শান্তি আলোচনার মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করা। দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে অসম সরকারকে সংবেদনশীলতার সঙ্গে আলোচনায় জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল অসমের শান্তিপ্রিয় মানুষের অন্যতম চাহিদা। ইন্দিরা দেবী যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে সেই আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালণ করেন। অনেক সমালোচক এই কাজকে সমালোচনা করেছেন, তার সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু যে সময় এই ডাকে তিনি সাড়া দেন সে সময় তিনি ভারতীয় সাহিত্যের আঙিনায় একটি উজ্জ্বল নাম। শিখ দাঙ্গার সময় তিনি ছিলেন দিল্লিতে। তখন তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই দাঙ্গা ও সাধারণ মানুষের অসহয়ত্বকে। তাঁর 'রক্তমাখা ধূলিধূসর পৃষ্ঠা' উপন্যাসে সেই অভিজ্ঞতা জীবন্ত হয়ে আছে।

টিপ্পনী

১৯৮২ সালে ইন্দিরা গোস্বামী পেয়েছিলেন সাহিত্যে অকাদেমী পুরস্কার তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মামরে ধরা তরোয়াল' এর জন্য; ২০০০ সালে 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি এবং ২০০2 সালে পদ্মশ্রী উপাধি পান। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ইন্দিরা গোস্বামী ২০১১ সালে দেহান্তরিত হন।

ইন্দিরা গোস্বামীর সাহিত্য কর্ম :

ইন্দিরা গোস্বামী প্রায় ২৫ টি গ্রন্থ এবং শতাধিক গল্প লিখেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গল্প আজ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাসের তালিকাটি নিচে দেওয়া হল -

অসমীয়া গ্রন্থ :

- চিনাকী মরম (ছোটগল্প সংকলন ১৯৬২) গৌহাটি, লয়ার্স বুক স্টল
- কইনা (ছোটগল্প সংকলন, ১৯৬৬) গৌহাটি, দত্ত বড়ুয়া এন্ড কোম্পানি
- হৃদয় এক নদীর নাম (ছোটগল্প সংকলন, ১৯৯৮) গৌহাটি প্রকাশন
- নির্বাচিত গল্প (ছোটগল্প সংকলন, ১৯৯৮), ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, ১৯৯৮
- প্রিয়গল্প (ছোটগল্প সংকলন, ১৯৯) জ্যোতি প্রকাশন, গৌহাটি
- চেনাবর স্রোত (উপন্যাস, ১৯৭২) লয়ার্স বুক স্টল, গৌহাটি (প্রথম সং)
- নীলকণ্ঠী ব্রজ (উপন্যাস, ১৯৮২) লয়ার্স বুক স্টল, গৌহাটি
- আহিরণ (উপন্যাস, ১৯৮০) বাণিপ্রকাশ, গৌহাটি
- মামরে ধরা তলোয়ার (উপন্যাস, ১৯৮০) সরাইঘাট প্রিন্টার্স, গৌহাটি (প্রথ সং)

- দাঁতাল হাতির উইয়ে খাওয়া হাওদা (উপন্যাস, ১৯৮৮) বাণীপ্রকাশ, গৌহাটি
- আধালেখা দস্তাবেজ (আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, ১৯৮১) স্টুডেন্ট স্টোর্স, গৌহাটি
- সংস্কার, উদয়ভানুর চরিত্র ইত্যাদি (উপন্যাস সংকলন, ১৯৮৯) শ্রীভূমি পাবলিশার্স, কলকাতা (প্রথম ও দ্বিতীয় সং) তৃতীয় ও চতুর্থ সং প্রকাশিত হয় স্টুডেন্ট স্টোর্স, গৌহাটি থেকে ১৯৯৩ তে।
- মহীয়সী কামতা (আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, ১৯৯) চন্দ্রপ্রকাশ, গৌহাটি
- উপন্যাস সংগ্রহ (১৯৯৮) স্টুডেন্ট স্টোর্স, গৌহাটি
- ঈশ্বরী জখমী যাত্রী আরু অন্যান্য যাত্রা (উপন্যাস ও ছোটগল্প সংকলন, ১৯৯০ প্রথম সং) স্টুডেন্ট স্টোর্স, গৌহাটি
- আহ্নিক (অনুবাদ কবিতা সংকলন) ওড়িয়া কবি জে. পি. দাস এর কবিতার অনুবাদ; ২০০১, সাহিত্য অকাদেমী

টিপ্পনী

কয়েকটি ইংরাজী গ্রন্থ:

- Ramayana from Ganga to Brahmaputra, B R Publishing, New Delhi
- Shadow of Kamakhya, Rupa & Co, New Delhi
- Selected Works of Indira Goswami, B R Publishing House, New Delhi
- I and My Writing, MILS, Delhi University
- A Man from Chinnamasta (tr. of her Assamese novel Chinnamastar Manutaha) Katha, New Delhi
- An unfinished Autobiography, Sterling Publishing Ltd. New Delhi
- Pages Stained with blood; (English Tr. of her Assamese novel Tej Aru Dhulire Dhusarita Pristha); Katha, New Delhi

তাঁর গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ:

- নির্বাচিত উপন্যাস (দুটি উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ; অনুঃ নন্দিতা বসু) ২০০৬ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা; এখানে 'দাঁতাল হাতির উইয়ে খাওয়া হাওদা' ও 'রক্তমাখা ধুলিদূসরিত পৃষ্ঠা' উপন্যাস দুটি পাওয়া যাবে।
- মামরে ধরা তরোয়াল (বাংলা অনুবাদ) সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত
- দাঁতাল হাতির উইয়ে খাইয়া হাওদা'(বাংলা অনুবাদ নন্দিতা বসু) 'প্রসাদ' পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়েছিল।

- ইন্দিরা গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ গল্প' (বাংলা অনুবাদ মুক্তি চৌধুরী), প্রতিভাস, কলকাতা
- ইন্দিরা গোসবামীর পাঁচটি গল্প (বাংলা অনুঃ মুক্তি চৌধুরি) আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় খন্ড) সম্পাঃ মননকুমার মণ্ডল, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ২০১৫
- অসমাপ্ত আত্মজীবনী (বাংলা আনুঃ পি পি ধর) সেন্ট এন্টনি কলেজ, মেঘালয়, শিলং
- আমি এবং আমার লেখা (I and My Writing এর বঙ্গানুবাদ, অনুঃ মননকুমার মণ্ডল) 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে' (দ্বিতীয় খন্ড, ২০১৫), নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
- ছিন্নমস্তার মানুষটি (উপন্যাস, অনুঃ মুক্তি চৌধুরি) এবং মুশায়রা, কলকাতা

টিপ্পনী

ইন্দিরা গোস্বামী তাঁর নিজের লেখালেখি নিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন। বক্তৃতাটির তারিখ ছিল ৮ এপ্রিল, ১৯৮৩; পরবর্তীতে বক্তৃতাটি প্রকাশ করেছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ। নীচে তার কিছু অংশ দেওয়া হল;

> ''আজ পর্যন্ত আমি সাতটি উপন্যাস লিখেছি। সবগুলিই আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে রচিত। আমি এর কোনোটি লিখেই তৃপ্ত নই। এগুলিকে আমি নির্মাণ করেছি কখনো কঠঘোর ও যন্ত্রণাকর উপায়ে, কখনো সুখ ও উল্লাসময় অভিজ্ঞতার মিশেল ঘটিয়ে। আমার কাছে কল্পনা হ'ল ফুলের কুড়ির মধ্যে পাপড়ি বিন্যাসের মত। এই ফুল প্রস্ফুটিত হতে পারে কেবলমাত্র পাপড়িগুলি উন্মোচিত হলে, আর জীবনের পুরোদস্তুর বাস্তব প্রক্ষেপণেই তা সম্ভব''। (অনুঃ মনন কুমার মণ্ডল)

আরও পরবর্তিতে ইন্দিরা গোস্বামী লিখেছিলেন ''মোর লেখার নেপথ্য কথা'' রচনাটি। এটি অসমীয়া ভাষায় রচিত।

> ''আমি বাস্তবকে অবলম্বন করেই লিখতে চেষ্টা করি। সকল লেখকের কাছেই সম্ভবত বাস্তব ও কল্পনার এক রহস্যময় সম্বন্ধন থাকে। দেহকে আত্মা থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না তেমনি বাস্তব ও কল্পনাকে আমি বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। এই ভাবনা যেন এক গভীর রহস্যের অতলে ডুব দিয়ে থাকে। . ব্যাক্তিগত বাস্তব দর্শন অভিজ্ঞতার স্পর্শ আছে আমার সমগ্র রচনাতে; তাই জীবন ও ভাবনার খণ্ড খণ্ড চিত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত'' (অনুঃ মুক্তি চৌধুরি; আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে; দ্বিতীয় খন্ড)

যাত্রা :

মূল গল্পের বিশ্লেষণী পাঠ :

ইন্দিরা গোস্বামীর সাহিত্যে তাঁর জীবনের উপাদান ও সমকাল খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়ে আছে। শৈশবের অভিজ্ঞতা যেমন ‘দাঁতাল হাতির উইয়ে খাওয়া হাওদা’ উপন্যাসে পাই, তেমনই ‘রক্তমাখা ধূলিধূসরিত পৃষ্ঠা’ তে পাই দিল্লিতে থাকাকালীন শিখ দাঙ্গার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। অসমের উগ্রপন্থী, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এমনই এক নির্মম অভিজ্ঞতা যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। স্বদেশের সাধারণ গরিব মানুষেরা কেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছে তা গভীরভাবে ভাবিয়েছিল তাঁকে। আলফা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারের আলোচনার পরিসর তৈরিতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নিজের খ্যাতি, সম্মান, সরিয়ে রেখেই স্বদেশের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি একটি সংবেদনশীল মন দিয়ে। সেই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তাঁর জীবনের প্রেক্ষাপটও। গ্রামের মানুষ গুলির সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন কীভাবে কোন যন্ত্রণা থেকে হাতে বন্দুক তুলে নেয় তা ইন্দিরা গোস্বামী বুঝতে চেয়েছেন এই সংবেদনশীলতা নিয়ে।

‘যাত্রা’ ছোটগল্পটিতে আমরা পাইএকদিনের ছোট্ট একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা। লেখিকা ও অধ্যাপক মিরাঝকারের কাজিরাঙ্গা অভয়ারন্য দেখে ফিরে আসার পথে কিছু ছোট ঘটনার কথা। দুজনেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন ; গৌহাটিচতে ছাত্রদের ডাকে সাড়া দিয়ে কোনো সাহিত্য সভায় এসেছিলেন তাঁরা। নিজেদের কাজ সম্পন্ন করার পর অধ্যাপক মিরাঝকারকে ইন্দিরা দেবী কাজিরাঙা অভয়ারন্য বেড়াতে নিয়ে যায়। সময়টা অসমের আলফা আন্দোনের অগ্নিগর্ভ সময়। গ্রামেগঞ্জে, জঙ্গলে ছড়িয়ে আছেন আলফার মুক্তিকামীরা; রাষ্ট্র যাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উগ্রপন্থী আখ্যা দেয়। যেখানে সেখানে মানুষ আহত, নিহত হচ্ছেন; বোমা পড়ছে, গুলি চলছে শহরে গ্রামে - গঞ্জে। কিন্তু সেই সাধারণ মানুষেরা কারা ? যাদের দাগিয়ে হয়েছে উগ্রপন্থীর নামে? গল্পটির মধ্যে বর্ণিত অভিজ্ঞতায় সেই প্রশ্ন যেন অনুরণিত হতে থাকে।

উচ্চ-মধ্যবিত্ত, শহুরে দুই পর্যটকের দৃষ্টিকোণ ধেকে গল্পটি বর্ণিত; তাঁরা রুচিশীল, তাঁরা সংস্কৃতিবান। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি তাদের আগ্রহ আছে, তাদের মন বোঝার সংবেদনশীলতা আছে। আকস্মিকভাবেই তাঁরা একটি পরিবারের অন্দরে ঢুকে পড়েছে ঘটনাক্রমে; একে একটি দুর্ঘটনাও বলা যায়। অপরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করে তাঁরা যখন মানসিকভাবে প্রশান্ত, ঠিক তখনই ঘটেছে দুর্ঘটনাটি। নিজেদের গাড়িটা গেছে খারাপ হয়ে রাস্তার মাঝখানে। রেডিয়েটার লিক্ করেছে, মেকানিক্ ছাড়া সারানো যাবে না। জঙ্গল

থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকা জায়গায় পড়তেই এই বিপত্তি। অগত্যা পথের ধারে এক চায়ের দোকানে চা খাবার জন্য বসতে হল তাদের। এমন নির্জন জায়গায় যেটা মানুষের কুঁড়ষেঘর সেটাই চায়ের দোকান। সত্তরোর্ধ বৃদ্ধা তাঁদের ডেকে বসালেন। চায়ের জন্য সসপ্যানে জল চাপিয়ে কথা শুরু করলেন, বয়স্ক মানুষেরা যেমন করে থাকেন। কথায় কথায় নিজের পরিবার ও বর্তমান অবস্থার পরিচয় বেরিয়ে এল - "দুই ছেলে আর দুই মেয়ে আছে। ওরা লেখাপড়া করছিল। একজন উগ্রবাদী দলে চলে গেছে, আর একজন কোথায় জানি না। কিন্তু আজ সাত বছর ধরেই নদীর উপদ্রব - জমি তো সব গিলেই ফেলল। ... বড় মেয়ে নির্মালী এক মিলিটারির সঙ্গে গন্ডগোল পাকিয়েছিল। আশেপাশের ছেলে ছোকরারা ওকে মেরে ঠ্যাং ভেঙ্গে দিল। মিলিটারিটা অবশ্য বাঁচল তবে দা'য়ের কোপ খেয়েছে একটা"। কথায় কথায় বেরিয়ে আসে তাঁর বংশ পরিচয়ের কথা বরবরুয়া বংশের লোক ছিলেন তারা। গুরুতর অপরাধীকে বাঁশের টুকরিতে বেঁধে জলে ডুবিয়ে মারার অধিকার ছিল তাদের। অচেনা পথিকও বাড়িতে এলে জুহা চালের ভাত আর পুকুরের কই মাছ খেয়ে যেত। আজ সে সব কোথায়। এখন জাতীয় সড়কের ধারে একটুকরো জীর্ণ ঘরে বসে চায়ের দোকান চালানো, আর খদ্দেরের জন্য প্রতিক্ষায় থাকা তার ভবিতব্য। নিখোঁজ সন্তানের জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা তার - করে তার দেখা পাবেন।

টিপ্পনী

মিরাজকার ও লেখিকাকে পেয়ে বুড়ির আত্মকথনে বেরিয়ে আসতে থাকে একের পর পারিবারিক দুঃখ - বেদনার কথা, দোতারা নিয়ে গান গাওয়ার কথা, গতিময় সংক্ষুব্ধ নদীর জমি খেয়ে নেবার কথা। অকপট সেই আত্মকথনে সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার বিড়ম্বনারই প্রকাশ ঘটেছে। আশ্চর্যের কথা এই যে বুড়ির স্বামী এত দীনতা, ভাগ্যবিড়ম্বনার মধ্যেই 'সরকারি লোকের পায়ে পড়তে পারে না'। বানভাসি দুঃস্থদের সরকারি টাকা ঠকিয়ে খায় যেসব কর্মচারীরা তাদের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে মানে লাগে বৃদ্ধার স্বামীর। কূলমর্যাদার কথা ভুলতে পারেন না তিনি। তার বংশের কেউ এক নাকি বরবরুয়া ছিলেন ; সোনার রিং লাগানো লাঠিতে রুপোর থোপায় সাজানো পানি জাপি (এ ধরনের ছাতি) নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। বসতেন জরির ফুলতোলা আসনে। বৃদ্ধ কিছুতেই সেই সোনালি অতীতেত উত্তরাধিকারের স্বপ্নরাজ্য থেকে বেরোতে পারেন না। অন্যদিকে বন্যার কুলপ্লাবী ধারায় বিধ্বস্ত হয় জনজীবন; তা থেকে মানুষকে বাঁচাতে বন্যাত্রাণ সমিতি তৈরি হয়, তারা রাস্তার ধারে দপ্তর খুলে বসে কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না ; এই সাধারণ মানুষ কিন্তু বিগত সাত বছরে কিছুই পায় নি। নদী খেয়ে নিয়েছে মাইলের পর মাইল জমি - ভিটে হারিয়ে ফেলেছে অজস্র পরিবার। দিফ্লুর পারে যেসব নামঘরে বুড়ির সাধের দোতারা সুরমূর্ছনা তুলত সেসব হারিয়ে গেছে। ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে বাহালি পর্যন্ত জনপদ একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে; জীবনের কোনো সুরাহা হয় নি তাদের। প্রতিটি পরিবারের মধ্যে থেকে তাই কয়েকজন ছেলে নিঁখোজ হয়েছে। অভাব-বঞ্চনা

- বেঁচে থাকার তাড়নায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তুলে নিয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। ইন্দিরা গোস্বামীই যেন একজন উচ্চ-মধ্যবিত্ত মানুষের শৌখিন ভ্রমণের যাত্রাপথে আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়ে সেসব দেখতে পেরেছেন তাঁর সঙ্গী অধ্যাপককে নিয়ে। সহস্র পুঁথিগত বিদ্যার থেকে সে অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

সাধারণ মানুষের জবানীতে কাজিরাঙা অঞ্চলের মনোরম প্রাকৃতিক শোভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনশীল সময়কে উপলব্ধি করেছেন। ১৯৬৬ সালের কুড়িটি বাঘ বর্তমানে ষাটটি ছাড়িয়েছে। গন্ডারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দেড় হাজার, আতি পাঁচশোর বেশি। শুনেছেন লোকপ্রচলিত বাঘের আক্রমণ কাহিনি, হাতিকে নিয়ে লক্ষী সিংহের সময়ে মোরামিয়া বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গল্প, ইত্যাদি। ইন্দিরা গোস্বামীর গল্পের একটা বৈশিষ্ট্যই হ'ল লোক জীবনের গল্পকথাকে প্রাসঙ্গিকভাবে আধুনিক কাহিনি কথনের মধ্যে বুনে দেওয়া। পুরনো অতীতের স্বর্ণদিন তার ঐতিহ্য তাঁর গল্পকে এক চালচিত্রের মাঝখানে এনে দাঁড় করায়। স্বদেশের গন্ধ - বর্ণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার ন্যারেটিভ। এই গল্পেও ব্যবহৃত হয়েছে সেরকম ইতিহাসের কল্পনামিশ্রিত সৃজন - যা জাতিয় রাস্তার ধারে এক ছোট্ট চা দোকানে কুপির অস্পষ্ট আলোয় শুনেছেন লেখিকা ও তার অধ্যাপক সঙ্গী। গল্পটি ছিল এরকম -

> "লক্ষীনাথ সিংহের সময়কার কথা! বুড়ো বয়সে রাজ্যপাট পেয়েছিল কিনা - কীর্তিচন্দ্র বরবরুয়ার সঙ্গে বেশ মাখামাখি ছিল। আমাদের এই রাজাদের মধ্যে লক্ষীকান্ত সিংহ আর গৌরিকান্ত সিং দেখতে বড় কুশ্রী ছিল। গৌরীকান্ত আফিং -এ বুঁদ হয়ে তো চোখই খুলতে পারত না। ... বরবরুয়ার আবার মোয়ামরিয়া মোহান্তর সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল ... এর কারণ ছিল অবশ্য অন্য। বছরের শেষে কর দেবার সময় মোয়ামরিয়া মহান্ত বরবড়ুয়াকে একটা রুগ্‌ণ হাতি দিল। নাহর ল্যাংড়া গিয়েছিল হাতিটা দিতে। বরবড়ুয়া রাগের মাথায় নাহরের কান দুটোই কেটে দিল। ... অঘ্রাণ মাসে ন'হাজার মোয়ামরিয়া রংপুরে কীর্তিচন্দ্রকে যে ধারালো ত্রিশুলে গাঁথল ঐ রোগা হাতিটাই কি এই ঘটনার মূলে ছিল না?"

এরকম গল্প বলার সময় মাঝেমধ্যেই বৃদ্ধার মুখ থেকে নিজের সন্তানের প্রতি উৎকণ্ঠা উঠে আসে। স্বামীকে রেললাইনের ধারে খোঁজ নিয়ে আসতে বলে ছেলের। সেখানে নাকি পড়শীরা কিছুদিন আগে তাকে দেখেছে। প্রতি মুহূর্তে ভয় এই বুঝি মিলিটারির গুলি খেয়ে মারা গেল তার ছেলে। আবার শোনা যায় সেকালের কথা বৃদ্ধার মুখে।

> "শোনো মা, গৌরিনাথ সিংহের কাহিনি আমি যতটা জানতাম এ অঞ্চলে আর কেউ তা জানত না। ... আফিম এর ঘোরে চোখ মেলে রাখতে পারতেন

না স্বর্গদেব। ... স্বভাবটা ও তেমন ঠিক ছিল না। তারা আইদেউর ঘরের সামনে দোলা আর বাহকেরা তৈরি হয়েই থাকত। দোলায় রূপোর দন্ড ও কারুকার্য দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিত সবাই। শোনো আমাদের ডিফলুর ওদিককারও নাকি এক মহিলা ছিলেন। তাকে সোনার জংফাই কেরু পাঠানোর খবরে এ-অঞ্চলে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। বরাহী, চুতিয়া, কলিতা, কায়স্থের মেয়েরাও রানি হয়েছিল।

টিপ্পনী

ছেলেকে রেললাইনের ধারে দেখতে পাওয়া গুজবে কান না দিতে বলে বৃদ্ধ নিজেই দোতারা নিয়ে গান ধরলেন। প্রদীপের আলোয় সে সুর আর কথাগুলি আধুনিক শ্রোতার মনে অনুরণিত হতে থাকল। মাকড়সার জালের মত অজস্র বলিরেখাসম্ভূত একটা মুখ যেন সেকালের জনসংস্কৃতির একটা স্মারক হয়ে উঠল শ্রোতাদের কাছে। এভাবেই তো বেঁচে আছে বর্তমানের সাধারণ মানুষ তাদের সমৃদ্ধ অতীত আর মৃত্তিকাসন্নিকর্ষ সুর নিয়ে। নাগরিক মানুষের এক সংক্ষিপ্ত শৌখিন যাত্রাপথে এর থেকে বড় আবিস্কার আর কী হতে পারে?

এই গানের সুর থেমে যেতেই গাড়ির রেডিয়েটরার সারানোর খবর আসে। উঠে যেতে হবে এবার লেখিকা ও মিরাঝকারকে। চাঁদের আলো মাখা সুরেলা শরীর নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে। আপ্লুত অধ্যাপক মিরজাকার কোটের পকেট থেকে বেশ কিছু নোট বের করে বৃদ্ধাকে এগিয়ে দিলে বৃদ্ধা অবাক হয়ে বলে - “বাবারা এত পয়সা কেন দিয়েছেন ? আমরা বরবরুয়া বংশের লোক, পানি -জাপি নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াই। এই সংগীত ! গুরুজনের আত্মার প্রতিধ্বনি এই সংগীত শুনে কেউ টাকা দিলে আমরা মনে বড় কষ্ট পাই। ... এসব কেউ বোঝে না। আজকাল কেউ - ই বোঝে না”। মেয়ে নির্মালী এর মধ্যে কোথা থেকে এসে উঁকি দেয়। বৃদ্ধার স্বামী চিৎকার করে বলে ওঠেন - “এই নির্মলীর মা, চায়েদর পয়সা হিসেব করে বাকিটা ওদের ফিরিয়ে দে”। নিজেদের সমৃদ্ধ অতীত থেকে পুরুষানুক্রমে পাওয়া এই সুর তো অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হতে পারে না! তাহলে তো নিজেকেই হারিয়ে ফেলা হবে। এই সুর, এই গান তারা বয়ে চলবেন আমৃত্যু - এতেই তাদের জীবনের সার্থকতা। নির্মালীর অস্তিত্ব যেন বিড়ম্বনা বাড়িয়ে তোলে। কোনো ভারতীয় সেনা অন্তসত্ত্বা করেছে তাকে - যেন এই ঘটনা সাধারণ মানুষের জীবনের ওপর নেমে আসা রাষ্ট্রপীড়নের মধ্যেই প্রতীকায়িত।

গল্পের শেষ পর্বে একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে। যে ঘটনা যাত্রাপথের এই অদ্ভুত আকস্মিক অভিজ্ঞতাকে সমকালীন প্রেক্ষিতের সঙ্গে যুক্ত করে এবং গভীর মানবিক দ্যোতনাকে প্রকাশ করে। অপূর্ব সঙ্গীতমূর্চ্ছনায় স্নাত হয়ে লেখিকা ও অধ্যাপক মিরাঝকার যখন নিজেদের গাড়ির দিকে ফিরবেন, কোটের পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বৃদ্ধাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, তখন হঠাৎই এক বিস্ফোরণ ঘটল। বাড়ির গায়েই এক বটগাছ থেকে লাফ দিয়ে

বয়েসে যুবক এবং জবরজং এক পুরুষ সামনে এসে দাঁড়াল। তার ঠোঁট আর চোখের কিনারের একটুকরো মাংস নেই - ফলে মুখখানা দেখাচ্ছিল ভয়ংকর। কেরোসিনের কুপির আলোয় তাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎই সে নির্মালীর পেটে এক লাথি কষিয়ে বলে উঠল "শালী বেশ্যা, ছেলেগুলো মেরে তোর পাটা তাহলে ভাঙেনি। জোয়ানটাকেও দু-টুকরো করতে পারে নি .. থুঃ" ঘেন্নায় থুতু ফেলে বৃদ্ধার হাতের কড়কড়ে নোটগুলি দেখতে লাগল। অতর্কিতে ঝাঁপীয়ে পড়ল সেগুলি হস্তগত করার জন্য, শিকারির মত লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে। আসলে যুবকটি হল বৃদ্ধার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সেই ছেলে - যে উগ্রপন্থীদের দলে নাম লিখিয়েছে। বৃদ্ধা চিৎকার করে বলতে থাকেন - "এ অতিথিদের পয়সা বাবা, ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে," । নিজের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত সঙ্গীতকে বিক্রি করতে হয় না। এই তাঁদের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষা। হারানো ছেলের সন্ধান কয়েকজন পড়শী তাঁকে আগেই দিয়েছিল। ডিফলুর কয়েকজন বলেছিল রেললাইনের ধারে তাকে দেখা গেছে ল কিন্তু তার স্বামী গ্রাহ্য করে নি। আজ ম্লান সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে অতিথি আসার সময় আকস্মিক সন্তানের অতর্কিত আগমনে বৃদ্ধা যুগপৎ খুশি ও যন্ত্রণাকাতর। কি অবস্থা হয়েছে তার চেহারার ! রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই এর ভয়াবহ পরিণাম যেন তার চোখেমুখে। সে এখন অতিথিদের দেওয়া টাকাগুলিকে হস্তগত করতে চায়; কারণঃ "জঙ্গলের চোরাকারবারিরা ইউ এস কারবাইন দুটি বিক্রি করতে চাইছে। আমার হাতে রয়েছে মাত্র কুড়ি টাকা। এখন পয়সা দরকার ... খুব দরকার"। টাকাগুলো নিবে সে যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল তেমনই অদৃশ্য হয়ে গেল। অপারগ বৃদ্ধের মুখে ফুটে উঠল যন্ত্রণাক্লিষ্ট হাসি।

এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে অধ্যাপক মিরাজকার ও লেখিকা গৌহাটি ফিরেছেন। কোনো কথা বলার প্রয়োজন হয় নি। তাঁদের উপলব্ধিতে এসেছে কেন এবং কীভাবে সাধারণ গ্রামের পরিবারগুলি রাষ্ট্রব্যবস্থার বঞ্চনার শিকার হয়েছে, উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও তাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছায় নি বরং তাদের আত্মসম্মান ভুলুণ্ঠিত হয়েছে। ঠকতে ঠকতে, বিক্রি হতে হতে একদিন মানুষগুলির পিঠ ঠেকে গেছে দেওয়ালে। তখন ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে; অমানবিকতার পথে এগিয়েছে তাদের সেই লড়াই। রক্তক্ষয়ী, আত্মধ্বংসী রাষ্ট্রের প্রত্যাঘাতে তার মন হয়ে উঠেছে আরও অনমনীয়। কিন্তু এই সমস্যা উন্নয়নের সমস্যা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির আত্মসম্মানের, তার স্বীকৃতির প্রশ্নের, গণতান্ত্রিক অধিকারের ন্যায্যতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ওপর দাঁড়িয়ে তৈরি হয়েছে। সমাজের উপরিকাঠামোর মানুষের উচিৎ সমস্যাগুলিকে সংবেদনশীলতার সঙ্গে দেখার। সরকারের উচিৎ সমস্যাটিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার প্রয়াস নেওয়া; তাদের সমস্যাগুলির প্রতি নজর দেওয়া।

আমরা জানি, ইন্দিরা গোস্বামী নিজে সরকারের সঙ্গে এই উগ্রপন্থী আন্দোলনের

আলোচনার প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অসমের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে তিনি সেই আলোচনায় মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। গল্পটি পড়ে উপলব্ধি করা যায়, অসমের মাটির কাছাকাছি মানুষের সংবেদন তাঁর মনে কতটা অনুরণন তুলত। অনুন্নয়নের সমস্যাটিকে নীচুতলা থেকে দেখা এবং বাইরের মানুষদের চোখে তাকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে তিনি অনন্য হয়ে উঠেছিলেন। একজন ভারতীয় মহিলা কথাকারের নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি এই সম্মানবোধ ও সৎ অবস্থান নেবার সাহস ইন্দিরা গোস্বামীকে স্মরণীয় করে রাখবে।

টিপ্পনী

বরফের রানি :

মূল গল্পের সংক্ষিপ্ত পাঠ :

সীতাদেবী একজন নারী যিনি পেশাগত সূত্রে দিল্লিতে থাকেন। তার বাবা পুলিশের কনস্টেবল ছিলেন, থাকতেন ফারুকাবাদে। দুবছর আগে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে । মা আর এক ভাই এখনো ফারুকাবাদেই থাকেন। সীতাদেবী শিক্ষকতা করেন দিল্লিতে; কাশ্মিরী গেটের কাছে এক বালিকা বিদ্যালয়ে। এই স্কুলের আরেক সহকর্মী স্নেহলতার সঙ্গে সিংসভা রোডের গুরুদ্বারের কাছে বরসাতিতে মেসভাড়া করে থাকে সে। সিংসভা রোড়ের গুরুদ্বারের কাছ থেকে কাশ্মীরীগেট পর্যন্ত প্রত্যহ স্কুলে যেতে হয় তাকে। রাস্তায় পড়ে রৌশনারা রোড়, মালরোড়, নাগিয়া পার্ক ইত্যাদি; যেখানে রাস্তার ধারে গোরু বসে থাকত দেখা যায়। এই গোরুগুলি বেওয়ারিশ, মালিকাহীন। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অথবা 'পশুপাখির প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ সমিচতি' কেউই এদের বিষয়ে দায়িত্ব নেয় না। এড়িয়ে চলে এদের প্রসঙ্গ। খোদ রাজধানির রাস্তায় গোরুদের এমন অবস্থা দেখতে হবে ইতিপূর্বে তা কল্পনার মধ্যেও ছিল না। সীতাদেবীর। সে মাঝেমধ্যেই এই গোরুগুলি সম্পর্কে সরকারি দপ্তরে চিঠি লিখব ভাবে, লেখেও আন্তরিকভাবে , কিন্তু কিছু কাজ হয় না। স্কুলে যাওয়ার পথে সকালে বাসে উঠে দুজনেই রাস্তার গোরুগুলি গুনতে গুনতে যায়, দেখতে থাকে পুরানো দিল্লির প্রচন্ড ব্যস্ত রাস্তায় তাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চলাফেরা, বসে বসে জাবর কাটা। যেকোনো সময় তাদের মাথা কিম্বা পায়ের ওপর দিয়ে বাস - লরি চলে যেতে পারে - সে আশঙ্কাও থাকে।

একদিন সে স্কুলে যাওয়ার পথে আবিস্কার করল এইটুকু রাস্তায় তিনটি জখমি বলদ রয়েছে। তাহলে সারা দিল্লি জুড়ে না জানি কত এরকম আহত, দূর্ঘটনাগ্রস্ত গোরু রাস্তার ওপর কাতরাচ্ছে। সীতাদেবী দেখল -

> "একটার সিং থেকে রক্ত ঝরছিল। একটার ঠ্যাঙের ক্ষুর গাড়ির চাকায় উড়ে গেছে, ঘায়ে মাছি ভনভন করছে। মুগারং এক বলদের ঠ্যাঙের খুরও চাকার আঘাত। পায়ে রক্ত নিয়ে সে এই বিপজ্জনক রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা

করছিল। এদৃশ্যটি বড় হৃদয়বিদারক। গোরুর ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পার হওয়ার দৃশ্যটি আয়নার টুকরোর মতই সীতাদেবীর ভেতরটা খোঁচাচ্ছিল। সেদিন স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ালেও মনটা বড় বিষন্ন ছিল। বেলা চারটেয় স্কুল থেকে ফেরার পথেও সেই জখমি গোরুগুলো নজরে পড়ল, শিঙে রক্ত, ঠ্যাঙের খুরে রক্ত!!"

টিপ্পনী

এই মর্মবিদারক দৃশ্যপট তার মন থেকে কিছুতেই সরছে না। ডিসেম্বর মাসের এক সন্ধ্যাবেলা, ধোঁয়া আর কুয়াশা ঢাকা রাস্তার নীলাভ আলোয়, গুরুদ্বারের কাছে বরসাতির হট্টগোলের মধ্যে সীতাদয়ী আবিস্কার করল একটি ধপধপে সাদা গাই। শরীরের গঠনে কোনো খুঁত নেই; দুধ সাদা গোরুটিকে স্বপ্নের মতন দেখাচ্ছিল। পেছনে তার বাচ্চাটি। স্তূপীকৃত জঞ্জালের মাঝে দাঁড়িয়েছিল সে; যেন এক টুকরো 'বরফের রাণি'। একদিন দুজনেই স্কুলে যাবার পথে নাগিয়া পার্কের কাছে আবিস্কার করল আহত বলদকে, যার খুরটাই নেই। সীতাদেবীর কষ্ট হ'ল; স্নেহা বলল - 'মোটরের ধাক্কা খেয়ে রাস্তার মানুষ পড়ে থাকলেও এরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়, পশুর কথা কী ভাববে'। সীতাদেবী ভাবে আমরাও কী তাহলে পশু হয়ে গেছি? স্কুলের ছুটির পর দুই বান্ধবী মিলে কাছেই কুদেসিয়া বাগিচায় 'সোসাইটি ফর দ্যা প্রিভেনশন্ অব ক্রুয়েলিটি টু দ্যা আনিম্যাল' এর দপ্তরে গেল। এক কমবয়েসি অফিসারকে পাওয়া গেল; সে বলল - "এই সব জখমি গোরু উঠিয়ে আনা আমাদের কাজ নয়। কিন্তু আপনাদের মত শিক্ষিত লোকেরা ফোন করলে আমরা অবশ্যই পিক্-আপ ভ্যান পাঠয়ে দেব। আসলে এটা আমাদের নয় দিল্লি নগর - নিগমের দায়িত্ব"। এসব বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করে বলল সে। আরও বলল, এখন পিক-আপ ভ্যান নেই, এলেই পাঠিয়ে দেব। প্রায় একঘন্টা অপেক্ষা করেও সেই ভ্যান ফিরে আর এল না।

সীতাদেবী এরপর নগর নিগমের অফিসে ফোন করলেন; ফোন লাগল না। মহেশরাজা নামক কর্মচারীটি নিজের সিটেও নেই। ওরা কিছুক্ষণ কুদেসিয়া পার্কের খন্ডহরে ঘোরাফেরা করে সময় কাটিয়ে মেসে ফিরে এল। সেদিন স্নেহলতা তার পুরুষবন্ধুর সঙ্গে বেড়ানো সেরে তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরেছিল। খাওয়া - দাওয়ার পর শীতের রাত্তিরে সেদিন সীতাদেবীর মনে হল, একবার জখম গোরুটিকে দেখে এলে কেমন হয়। পিক-আপ ভ্যান এসে আদৌ নিয়ে গেল কিনা বোঝা যাবে। শীতপোষাক পরে দুজনেই বেরিয়ে পড়ল। গোলচক্করের কাছে এসে তারা দেখল কাঠীকাবাবের দোকানে ভিড় লেগেই আছে, পান দোকানে প্রচুর লোক, কাঠিকাবাবের প্লাস্টার-চটা সিঁড়িতে বসে আছে 'আধপাগলে ছোটেলাল'। ওদের পিছু নিল সেও। লাইটপোস্টের তলায় এসে ওরা দেখল গোরুটা নেই। দুটো কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিল; সীতাদেবীর ইচ্ছে ছিল তাদের জিজ্ঞেস করে 'এম সি ডি'র গাড়ি এসেছিল কিনা। কিন্তু

স্নেহলতা বারণ করল। এই রাত্তিরে আর ঠান্ডায় ঘোরার দরকার নেই। আকস্মিক পিছন থেকে ছোটেলাল বলে উঠল - 'বেওকুফ। এম সি ডিকা গারি নেহি আয়া। মুঝে মালুম হ্যায় কৌণ লে গইয়া। উস আদমি কো ম্যায় প্যাহচান সকত হুঁ'। ছোটেলাল বলছে, রাস্তার অন্ধকারে এসে ট্রাকে করে কসাই তুলে নিয়ে গেছে বলদটিকে। একাজ করে থাকে কসাই - "লাগতা ওহি কসাই হ্যায়। রাস্তাকি গাই ওসে বখুবি পহচানতি হ্যায় .... " সীতাদেবীর দুর্ভাবনা বেড়ে যায়। মনে কষ্ট হয় শেষ পর্যন্ত কসাই - এর হাতে পড়ল জখমি বলদ! এসব ভাবতে ভাবতে তারা ঘরে ফিরে আসছিল। হঠাৎ ফেরার পথে পায় সিংসভা রোড়ের কাছে বরফের রাণি; বসে জাবর কাটছে। কাছেই আরো একটি আওয়ারা গোরু, যার পায়ের উরুতে সি এম ডি.র নম্বর মারা।

স্কুল শিক্ষিকা সীতাদেবীর মনে সাদা বলদ ও তার বাচ্ছাটি গভীর ছাপ ফেলেছিল। তার নারীত্ব, সংবেদনশীলতা, মানবিক অনুভূতিগুলি এমনই দুটি মনুষ্যতর প্রাণীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল আশ্রয়।

> "সীতাদেবী বাসে শক্তিনগর চৌকি পেরিয়ে নজফ্গদরের দিকে, নয়তো মালরোডের খাইবারপাস হয়ে কাশ্মীর গেটে, কিংবা ঘন্টাঘর থেকে কোলহা রোড়ের সামনে দিয়ে যেদিকেই যাই না কেনো এক চৌকিতে ধবলীকে অবশ্যই তার বিচিত্ররঙের বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে না অন্য গোরুদের সঙ্গে বসে থাকতে দেখে। বাচ্ছার নাক - কান - মুখ চাটতে থাকে মা। নইলনে বাচ্চাও মায়ের পা গলা চাটে, এমনকী বাঁটও চুষতে থাকে। দুধছাড়ার কী জানি বেশিদিন হয় নি। সকালে বাজারহাট করতে যাবার সময় বাচ্চা সহ ধবলীকে দেখা সীতার অভ্যেস হয়ে দাঁড়াল"।

সীতাদেবীর যৌবনের অনুভূতিগুলি যেন এই অপূর্ব সুন্দর গোরুটিও তার বাচ্চার শারীরিক সৌন্দর্যের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছিল। এই অঞ্চলে দিল্লির পুরানো সওদাগর থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী বণিকদের বসবাস। তারা ও তাদের সতী ঘরণিরা সকালবেলায় স্নান সেরে গলবস্ত্র হয়ে মুগা রঙের গোরুটি বা অন্যান্য গোরুর সামনে চালের ভুসি, গমের খোসা দিয়ে পুণ্য অর্জণ করেন। শারিরীক ভাবে প্রতিবন্ধী এক পাঁচ ঠ্যাং - ওয়ালা গোরুর প্রদর্শন যাত্রা করে কয়েকজন মোহান্ত। তাতেও শেঠ-শেঠনিরা যোগ দেয়। কিন্তু রাস্তার এই ছন্নছাড়া গোরুটিতে কেউ দেখে না।

সীতাদেবীর স্বপ্নে আসে এই গোরুটি, তার সুন্দর বাচ্চাটি সহ। কুদসিয়া বাগিচার খন্ডহরে জেগে ওঠে ইতিহাস। সবুজ ঘাস ও গুলমোহর ঝোপে ভরে গেছে বাগিচাটি; তার মধ্যে দিয়ে ঘোড়াগাড়িতে চড়ে আসছেন নবাব মহম্মদ ও উধম বাঈ। দাসদাসীরা পিকদানি আর হুঁকো নিয়ে চলেছে পেছনে পেছনে। "জামান খেতাব ভূষিত মহম্মদ শাহের প্রিয় হিন্দু

বেগমকে কুদসিয়া সাহেবের ভালোবাসার উপহার এই বাগিচা"। চারিদিকে আতরের গন্ধে সুরভিত। অপুর্ব সুন্দর এই নির্জন পরিবেশ, কোথাও কোনো অশান্তি হট্টগোল নেই। বাস আড্ডার ঘর্ঘরানি নেই, মানুষের ঠেলাঠেলি নেই। আর তারই মধ্যে কুদাসিয়া বাগিচার সবুজ ঘাসবনে চরে বেড়াচ্ছে, লুটোপুটি খাচ্ছে 'বরফের রাণি' - সঙ্গে মুগা রঙের বাছুরটি। শরীরে কোনো ধুলোবালি পর্যন্ত নেই - যেন দুটি বরফের টুকরো। রামকিশোর রোডের পরিত্যক্ত খন্ডরটি যেন জেগে উঠেছে; শ্যানডালিয়ার মোমের আলোয়, মার্বেলের ঝকঝকে মেঝেয় যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই বাড়ি। এই স্বপ্নের মধ্যে সীতাদেবীর যৌবনের অনুভূতি প্রকাশ ঘটতে থাকে।

সকালে উঠে বান্ধবী স্নেহাকে সে এই স্বপ্নের কথা বলতে পারে না। বাসরুটে শক্তিনগরের চৌকির প্রকান্ড ট্রাফিক আইল্যান্ডে দেখতে পায় সেই বরফের রানি'কে। সেদিনক স্কুলের কাছের জিপিও থেকে এম এস ডি কে আবার ফোন করে সীতাদেবী। কড়া উত্তর পায় - "স্ট্রে ক্যাটলদের ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে পারব না"। এরপর প্রেস ইনফরমেশন অফিসার রুস্তম পাশার সঙ্গে কথা বলে সীতাদেবী; তিনিও তাদের অপারগতার কথা জানিয়ে দেন।

> "এইসব আওয়ারা গোরু আমাদের মাথা গরম করে রেখেছে। পিক আপ ভ্যান পর্যন্ত চিনতে পারে গোরুগুলো। ওদেদর মালিক সম্পর্কে আমাদের কোনো প্রশ্নই করবেন না আপনি। ... হ্যাঁ বেশিরভাগ গোরুর মালিকই এক একজন 'মাসল ম্যান'। প্রয়োজনে লাঠির আঘাতে মানুষ খতম করে দিতে পারে। ... শুনুন এই দিল্লি শহরে মানুষের মাথা গোঁজার জায়গা নেই। গোরু রাখবেন কোথায়? আপনি কি জানেন এই গোরুর কিছু মালিক ফুটপাতে বাস করেই ব্যবসা চালাচ্ছে? অসংখ্য সরকারি এলাকা এনক্রোচ্ করেছে"।

এসবের এক সপ্তাহ পরে একদিন স্কুল ছুটির পর স্নেহার সঙ্গে ঘন্টাঘরের কাছ থেকে বাসে উঠল সীতাদেবী। প্রচন্ড ভিড়, ঠেলাঠেলি, বাদুরঝোলা হয়ে মানুষ চলেছে গন্তব্যে। ছাত্র বিক্ষোভে স্টিফেন্স কলেজের পাশ দিয়ে না গিয়ে ঘুরে গেল বাস। আচমকা কিছু লেকের চেঁচামেচিতে, রাস্তার জ্যামে থেমে গেল বাসটি। এক্সিদেন্ট হয়েছে। একজন বলল - "খুদা কি সুকুর হ্যায় আদমি নেহি মরা, এক গাই মরী হ্যায়"। সীতাদেবী লেকের ভিড় ঠেলে দেখতে পেল "ঐ তো ওর ধবলী বরফের রাই নিথর হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। মাথার ওপর দিয়ে বাসের চাকা চলে গেছে। ইস্ ওই তো বাচ্চা। মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হায় হায়, মায়ের মাথার রক্তের স্রোত এসে বাচ্চার কাছে জমা হয়েছে"। সীতাদেবীর খুব কষ্ট হয়। এক তীব্র মর্মযন্ত্রণা নিয়ে মেসে ফিরে আসে। কিন্তু রাস্তার 'আওয়ারা' গোরুদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তার 'মিশন' সে

টিপ্পনী

ছাড়ে না। চেষ্টা চালাতে থাকে।

বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা :

নারীর সংবেদন হৃদয়ের প্রকাশ ইন্দিরা গোস্বামীর কথাসাহিত্যে খুব গুরুত্ব পেয়েছে। ‘বরফের রানি’ গল্পটিতে সীতাদেবীর মনের অন্তর্মহলের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকেও একথা স্পষ্ট হয়। আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে, তাঁর গল্প - উপন্যাসে মিশে থাকে নিজের জীবন অভিজ্ঞতার এক বড় অংশ। ইন্দিরা গোস্বামী জীবনের দ্বিতীয় পর্বে পেশাগত সূত্রে দিল্লিতে থেকেছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা সূত্রে থাকাকালীন সেখানকার রাস্তাঘাট , মানুষজন, সমাজ সম্পর্কে এটা ধারণা তৈরি হয়েছিল তাঁর মনে। সেখানে যেমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল শিখ দাঙ্গা সমকালীন সময়ের (যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ‘রক্তমাখা ধূলি ধূসরিত পৃষ্ঠা’ উপন্যাসে), তেমনই ছিল সেখানকার রাস্তাঘাটে সম্মুখিন হওয়া অদ্ভুত কিছু অভিজ্ঞতা। তৎকালীন সেসব অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক বয়ানের মধ্যে ধরা পড়ে একজন নারীর সংবেদনশীলতা। আত্মকথনকে এমনভাবে নিজের সাহিত্যের উপাদানে পরিণত করতে খুব কম ভারতীয় লেখিকাই পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার দিল্লি দেশের রাজধানী হবার কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ও প্রদেশের মানুষজনের সাক্ষাৎ - মেলামেশা সেখানে স্বাভাবিক। বিচিত্র মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল। এই গল্পে সীতাদেবীর মধ্যে ইন্দিরা গোস্বামীর কোনো প্রত্যক্ষ আত্মপ্রক্ষেপ নেই একথা ঠিক, কিন্তু তাঁর মত সংবেদনশীল নারীমনের অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকেই যে মনুষ্যতর প্রাণীকে নিয়ে এধরণের গল্প লেখা হয়েছে সেকথা নিশ্চিত বলা যেতে পারে।

গল্পটিতে একজন পূর্ণযৌবনা নারীর মানসিক সংবেদনশীলতার সূক্ষ্ম বিষয়গুলি উঠে এসেছে। মনুষ্যেতর প্রাণীর অসহায়ত্বের প্রতি সীতাদেবীর টান তাঁর মনের সংবেদনশীলতারই প্রকাশ। মহিলা লেখিকাদের লেখার মধ্যে এই ধরণের মনস্তাত্ত্বিকতার প্রকাশ নতুন কিছু নয়। ইন্দিরা গোস্বামীও তার ব্যাতিক্রম নন । দিল্লির রাস্তাঘাটে ধবলার অসহায়ত্ব, বেওয়ারিশ গোরুগুলির ঘোরাফেরা তার নজর আকর্ষণ করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে তাকে তুলে নিয়ে যাবার কেউ নেই, দেখার কেউ নেই। অবলা জীবের রাস্তাঘাটে এইভাবে পড়ে থাকা তার পক্ষে মন থেকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। দিল্লির মত ব্যস্ত শহরের মর্মান্তিক জীবনযুদ্ধ, অল্প এতটুকু জায়গার জন্য মরণপণ লড়াই, মানবিক মূল্যোধের অভাবজনিত দৃশ্যপটের মধ্যে দাঁড়িয়ে সীতাদেবীর এরকম মানবিক অনুভূতিগুলি এক ধরনের বিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির উদাসীনতাকে তীব্র কশাঘাত করতে থাকে। স্কুলশিক্ষিকা এক নারীর এই লড়াই যা গোটা নাগরিক সমাজের আমানবিকতাকে উন্মেচিত করে দেয়।

নারী হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে মহিলা লেখকরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে তাদের কাহিনীতে বুনে দিতে পারেন। সমাজব্যবস্থার বিবিধ অসামঞ্জস্য, লিঙ্গ বৈষম্যের মধ্যে মাথা তুলতে চাওয়া নারীর জীবনসংগ্রাম আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মহিলা লেখিকাদের রচনায় খুব বলিষ্ঠভাবে উঠে এসেছে। সামাজিক নিপীড়ন, বঞ্চনা, অসহায়ত্ব, অমানবিকতার মধ্যে দাঁড়িয়ে একেকজন নারী যেভাবে নিজেদের মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যান তা বিংশ শতকের ভারতবর্ষের সাহিত্যে বিশেষ পরিচয় বহন করে। নারীমনের বিচিত্র অনুভব, সংবেদনশীলতা এমনকী কৌনিকতা পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে একজন মহিলা লেখিকা অনেক বেশি বিশ্বস্ত - একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। উনবিংশ শতকের পাঠকের কাছে যা অবিশ্বাস্য ছিল আজ তা বাস্তব; নারীমন মনস্তত্ত্বের সেই বিপুল জগৎ ক্রমশই পাঠকের সামনে তুলে ধরছে সে স্বাধীনভাবে। পুরুষ সাপেক্ষতার বাইরে তার নিজস্ব মনোজগত, ভালোলাগা, মন্দলাগা, ইচ্ছে - অনিচ্ছেগুলি যে অনুভবতন্ত্রের বিশিষ্টতাকে উপস্থাপিত করে তা নারীর নিজস্ব।

ইন্দিরা গোস্বামীর গল্পে নারীর বিশিষ্ট মানসিক চারিত্রিক আমরা দেখি বলিষ্ঠভাবে রূপায়িত হতে। আত্মকথনের ভঙ্গি যেমন তাঁর অনন্য, নিজস্ব অভিজ্ঞতার উষ্ণতা যেমন তাঁর নারি চরিত্রগুলিকে জড়িয়ে থাকে তেমনই তারা স্বাধীন। কর্মস্থলের নারী, সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সংগ্রামে নিয়োজিত নারী, সামাজিকভাবে অনাকাঙ্খিত নারী, নীচুশ্রেণীর নারী - সকলেই তাঁর কলমে মানুষের মর্যাদা পায়; শুধু তাই নয়, তারা মানবিক অনুভববেদ্যতার প্রতিতুলনায় যে-কোনো অন্য চরিত্রের সমগোত্রীয় হয়ে ওঠে। নারী মনস্তত্ত্বের বিশিষ্ট জগৎকে এত সাহসী ভাবে ভারতবর্ষের খুব কম লেখিকাই তুলে ধরতে পেরেছেন। সীতাদেবী সেই পঙক্তির একজন মাত্র। অবিবাহিত এক স্কুল শিক্ষিকা দিল্লির মেসে থেকে চাকরি করছে আর নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জনাকীর্ণ শহরের অমানবিক মুখাবয়ব আবিস্কার করছে।

যৌবনবতী এই নারীর যৌন মনস্তত্ত্বও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ইন্দিরা দেবী। অপরূপ শারীরিক কাঠামোর ধবলী গাই ও তার বাচ্চার রূপকল্পটি স্বপ্নে ফিরে এসেছে সীতাদেবীর। কুদসিয়া বাগিচার খন্ডরের মধ্যে ইতিহাস জেগে উঠেছে স্বপ্ন কল্পনার মধ্যে এক টুকরো 'বরফের রাণির' মত ধবধপে সাদা গাভিনীর আহ্লাদী রঙ্গের দৃশ্যপট সীতাদেবীকে আলোড়িত করেছে ঘুমের মধ্যে। অন্যদিকে রাস্তায় বাস চাপা পড়ে গাভিটির মৃত্যুর আকস্মিকতা সীতাদেবীকে অসম্ভব কষ্ট দিয়েছে। গল্পের শেষে কিন্তু দিল্লির রাস্তাঘাটে অন্য 'বেওয়ারিশ' গোরুগুলির আশ্রয়ের জন্য সীতাদেবীর কর্মদ্যোগের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংবেদনশীল এক নারীর নতুন জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি চলতেই থাকছে। তা কখনো হেরে যেতে পারে না। জীবনের প্রতি একজন নারীর এই সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ গল্পটির গুরুত্বপূর্ণ ভরকেন্দ্র।

টিপ্পনী

উলঙ্গ শহর :

মূল গল্পের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণী পাঠ :

টিপ্পনী

উর্মিলা ভট্টাচার্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের লেকচারার। বছর তিনেক হল তিনি দিল্লিতে এসেছেন। উর্মিলার স্বামী ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়ে আর ফেরেন নি। এক ফরাসী মহিলাকে ভালবেসে সেখানেই থেকে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সেসব কাহিনির অতিরঞ্জিত বয়ান আজও কান পাতলেই শোনা যায়। সুন্দর সংসার ছারখার হয়ে গেলে উর্মিলা ভাই - বোনদের সংসারে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইতিমধ্যে তার বাবা - মা স্বর্গগামী। অবশেষে অনেক ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে দিল্লি এসে পৌঁছানোর পর উর্মিলাদেবীর মনে হয়েছে "যেনতেন প্রকারেণ সে তার ভাঙা সংসারকে আবার নতুন করে গড়ে তুলবে। ফলে ওর মনটা শিকারির মনে রূপান্তরিত হ'ল। যেসব পুরুষের সান্নিধ্যে আসত, প্রত্যেকের মধ্যেই নিজের প্রিয়জনকে খুঁজে সে ছটফট করত"।

উর্মিলা ভট্টাচার্যের দিল্লির বাড়িতে তার বধুদের যাতাযাত লেগেই থাকত। তার মধ্যে দিল্লির প্রখ্যাত সাংবাদিক রূপচন্দ্র ও অধ্যাপক ঠাকুর বিশিষ্ট। দুজনেই তার প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত। একা থাকেন উর্মিলা ভট্টাচার্য, একাকীত্ব কাটতেই চায় না। বন্ধুদের সঙ্গে সান্ধ্যকালীন আড্ডাতেই তার মুক্তি। ১৯৭৪ সালের দিল্লি শহর; অস্থির সময়, দাঙ্গার ভয় ওঁত পেতে থাকে। শহরের কুখ্যাতি ছড়িয়েছে চারিদিকে। এরই মধ্যে একদিন অধ্যাপক ঠাকুর ও সাংবাদিক রূপচন্দ্র উর্মিলার ঘরে এসে আবিষ্কার করলেন একটা 'ভূতের মত' বাচ্চা ছেলেকে।। তার নাম জগন্নাথ। ওখলার স্লাম এরিয়ার পথশিশু জগন্নাথকে উর্মিলা মানুষ করানোর অভিপ্রায় নিয়ে সঙ্গে করে তুলে এনেছেন। শিশু বয়েস থেকেই বাড়ির ভৃত্যদের প্রতি তার সমবেদনা, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পিতার কাছে তাদের এমন সামাজিক আবস্থার কারণ সম্পর্কেও শুনতে শুনতে এই সমবেদনা একটা নৈতিক ও মানবিক দায়তে পর্যবসিত হয়েছে তার মনে। জগন্নাথ তার বাড়ির এটা -ওটা কাজ করে, অতিথিদের ফাই-ফরমাশ খাটে, খায় - দায় পড়াশুনো করে। ওখলার স্লাম এরিয়ায় যেদিন 'প্রেতিনীর মত' শতচ্ছিন্ন জীর্ন পোষাক পরিহিতা জগন্নাথের মা উর্মিলা ও ইংরাজির অধ্যাপিকা কৃষ্ণাদেবীকে ধরেছিল সেদিন এই কংক্রীট নগরে সমবেদনার মানবিক দৃশ্যপট যেন ব্যঙ্গময় হয়ে উঠেছিল। সে বলেছিল-

> "তোমার হাতে ও কাঁধে ব্যাগ। তোমরা নিশ্চয়ই ছেলে - মেয়ে পড়াও। নাও না আমার ছেলেটাকে নিয়ে নিজের নাম লিখতে শিখিয়ে দাও .... তোমরা শিক্ষিত। আমাদের মত হরিজনদের হাতে জল খেতে নিশ্চয়ই তোমরা

ইতস্তত করবে না। খাদি কাপড় পরে যে লোকটি রাষ্ট্রভাষা শেখাতে এসেছিল, সে আমার হাতে গরম জল খেয়েছিল .... নিয়ে যাও না, ও তোমাদের স্নানের জলটুকু গরম করে দেবে"।

উর্মিলা প্রত্যুত্তরে বলেছিল - "দাও আমাকে দিয়ে যাও ছেলেটা। আর কিছু না পারলেও রাষ্ট্রভাষা শেখাব, কিংসওয়ে ক্যাম্পের হরিজনদের সঙ্গে বসে পরীক্ষা দিতে পারবে"। তার সঙ্গী কৃষ্ণাদেবীর কিন্তু বিষয়টা একেবারেই পচ্ছন্দ ছিল না। জগন্নাথকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার এই কাহিনি সান্ধ্যকালীন আড্ডায় শুনতে শুনতেই ওঠে দলিত কবিতার প্রসঙ্গ - নারায়ন সুরভে, অরুণ, নামদেও ধাসাল এর কবিতা; যারা এখন উদিত সূর্যের স্বপ্ন দেখছে।

একদিন 'কিংসওয়ে ক্যাম্পে'র হরিজন বিদ্যালয়ে গেল। সেখানে দেখা হল হিন্দিভাষার পন্ডিত বিষ্ণু প্রভাকরের সঙ্গে। তিনিও সপ্তাহে দুদিন জগন্নাথকে উর্মিলার বাড়িতে এসে পড়িয়ে যেতে লাগলেন। অধ্যাপক ঠাকুর একদিন বললেন - "আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি ওকে মানুষ করতে পারবে। ... আমাদের এই ক্ষুদ্র দেহে এমন কিছু দুর্দমনীয় শক্তি থাকে যে আমরা নিজেও তা জানি না"। দুমাস পর একদিন জগন্নাথের মা দেখা করতে এল। সে এখন একটু পরিচ্ছন্ন হয়েছে। মিন্টুব্রিজে কাজ পেয়েছে, ঠিকাদারের আন্ডারে থাকে। উর্মিলার কাছ থেকে কিছু পয়সাকড়ি সাহায্য নিয়ে চলে গেল। সেদিন বিকেলবেলা অঙ্কের গবেষক যশোবন্ত এল উর্মিলার কাছে। পুরনো বন্ধু যশোবন্তের মধ্যে একদা সে খুঁজে পেয়েছিল তারা ভাঙা - চূর্ণ - বিচূর্ণ সংসারটি আবার সাজিয়ে তোলার ঠিকান। যশোবন্তরা লাহোরেদের রিফুজি। অনেক পোরানো স্মৃতি জেগে উঠল আলাপ হবার সময়ে। জগন্নাথকে দরজা না ধাক্কাতে বলে ওরা দুজনে সামনাসামনি কথা বলতে বসল। তারা দুজন কি আরও কাছাকাছি আসতে পারে না? এত দিনের আলাপ! উর্মিলার মনে হল কিছু একটা হয়ে যাক এই মুহূর্তে। আকস্মিকভাবে হিংস্র পশুর মত যশোবন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল উর্মিলার ওপর। বলল - "ইউ গিভ মি সেক্স"। মুহূর্তে ভালোবাসার কল্পমিনার টলে গেল উর্মিলার মনে। কান্না পেল। ছোট ছেলের কাছেও চেখের জল লুকানোর কোনো চেষ্টা করল না সে - "মমতাময়ী মায়ের মতই লাগল তাকে, এই মাতৃরূপী মানুষটির কাছে যেন নিৎসঙ্কোচে গলা ছেড়ে কাঁদতে পারে সে"। জগন্নাথকে নিয়ে বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে উর্মিলা বলল - "এই জগৎটা বড় নোংরা রে। তবু আমরা বেঁচে থাকব .. আয় কাছে আয়"।

কিছুক্ষণ পরেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন সাংবাদিক রূপচন্দ্র ও অধ্যাপক ঠাকুর। শুরু হল গল্পগুজব; বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প। ১৯৫৮ সালের সায়েন্স কংগ্রেসের গল্প, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকূলপতি মরিস গয়ার এর গল্প, ভি পি রাও উপাধ্যক্ষ থাকাকালীন 'ডিউক অব এডিনবার্গ' আর আইসেনআওয়ার সাহেবের আসার কাহিনি, ইত্যাদি। সাংবাদিক রূপচন্দ্র বলেছিলেন

টিপ্পনী

অভিজাত শ্রেণীর আতিথেয়তায় দিল্লির তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের 'মুশায়রা'র গল্প এবং সেইসব হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির গল্প। গল্পে উঠে আসছিল দিল্লির অতীত ইতিহাস। জেনারেল হাডসন কীভাবে ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, তাকে এই খুনী দরজার কাছে ডেকে এনে উপহার দিয়েছিলেন মৃত পুত্রের মুন্ডু। আজও রেঙ্গুনের সদর বাজারের আটান্ন নম্বর বাংলোর এক কোণে রয়েছে জাফরের কবর। এসব গল্পের মধ্যেই এক লাথিতে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল জগন্নাথ। তিনজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে, আর বলল-

টিপ্পনী

> "নিচের দোকানদাররা তোমার বদনাম গায়। আমার মা খিদের জ্বালায় সেই ডেভ্‌লাপমেন্টের ঠিকাদারের সংগে বসে চা রুটি খায়। তোমার তো খিদের যন্ত্রণা নেই। তোমার তো খিদের যন্ত্রণা নেই। তোমাকে কেন এই হারামজাদাদের সঙ্গে রাতদুপুর অবধি আড্ডা মারতে হয়? কেন? ঝুপড়ির ওই নষ্ট মেয়েমানুষের সঙ্গে তোমার তফাত কী?

এর পরদিন থেকে জগন্নাথ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। রূপচন্দ্র বা অধ্যাপক ঠাকুর কেউই বিশেষ মাথা ঘামালেন না এ বিষয়টি নিয়ে। আড্ডা চলতেই থাকল। জগন্নাথ চলে গেল এক ধরনের নিঃসঙ্গতা অনুভব করল উর্মিলাদেবী। এদিকে তার প্রবেশ্ন পিরিয়ড শেষ হয়েছে। একদিন ডিপার্টমেন্টের হেডের কাছে গিয়ে ইন্টারভ্যু দিয়ে এল। হয়ে গেল চাকরির কনফার্মেশন। ডিসেম্বর মাসের এই বিকেলবেলায় সে কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছিল না। হঠাৎই মনে হল ব্যাগে ঠিকানা আছে ওখলার স্লামের। জগন্নাথের খোঁজে উর্মিলা গেল সেই স্লাম সাম্রাজ্যে। "একটা সময়ে পরিষ্কার জামা - কাপড় পরে কাউকে এই পাওড়ায় ঘুরতে দেখলে স্লামের লোকেদরা তাদের চোরাকারবারি বলেই ভাবত। টার্কম্যান গেট ও ওখলার স্লামের অস্থিচর্মসার ভিখিরিরা মাথার ওপর চাল হারাবার ভয়ে অবশ হয়ে যেত"। আজ সেখানের অবস্থা বদলেছে। অধ্যাপিকা উর্মিলা এখানে দেখা পেল জগন্নাথের মায়ের। তার কাছ থেকে জানা যায়, জগন্নাথ উর্মিলার বাড়ি থেকে ফিরে খুবই হতাশ আবস্থায়; "এখনও নাক টিপলে দুধ বেরোয় যে ছেলের সে বলে কিনা পৃথিবীর সব মানুষই মন্দ। যাদের ভালো বলা বলা হয় তারা শুধু অভিনয় করছে"। জগন্নাথকে আবার তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ রেখে উর্মিলা ফিরে আসে সেই বস্তি থেকে। বলে আসে তার মা'কে, "আমি পড়াব বলাই নিয়েছিলেম। শপথ নেওয়া আমার কোনো বিলাসিতা নয়"।

ডিসেম্বর মাসের এক অকাল বৃষ্টির দিন সকালবেলা জগন্নাথ আবার ফিরে আসে উর্মিলার বাড়ি। "গত চারমাসে তার বয়েস যেন বেড়ে গেছে। রুক্ষ্ম চুল, কর্কশ গায়ের চামড়া। ছেঁড়া জামাকাপড় - মুখে বিড়ির গন্ধ"। তার কথা থেকে উর্মিলা জানতে পারে, এতদিন সে ছিল নিগমবোধঘাটের শ্মশানে। উর্মালা একাকীত্ব অনুভব করলে। এই গোটা শহরে বন্ধু বলতে ওই

তিনজন। তার বাবা - মা ছিলেন অত্যন্ত সৎ, অত্যন্ত সুসংস্কৃত পরিবেশে বড় হয়েছে সে। কিন্তু কেউ তাকে কী বুঝতে পেরেছে? অনুভব করতে পেরেছে তার সংবেদনশীল মন? তাহলে কী এই মহানগরে জগন্নাথের মনের মধ্যেই প্রথম সোনার সন্ধান পেল উর্মিলা ? অমূল্য সেই মানবিক সম্পর্কের টান। কিন্তু জগন্নাথ ও তার মধ্যে একটা প্রাচীর যেন উঠে গেছে।

পরদিন থেকে তিনদিন টানা অকাল বৃষ্টি শুরু হল সারা দিল্লি শহর জুড়ে। সেকদিনই কেউই এল না তার বাড়িতে। অলস সারাদিন কাটতে থাকল বই নিয়ে। চায়ের সময় ও ভাতের সময় জানত জগন্নাথ। চতুর্থদিন দিল্লি শহরটাই যখন পঙ্গু হয়ে পড়েছে তখন জগন্নাথ প্রশ্ন করল - "এই তিনদিন আপনি ঘরে বসে কেউ তো সঙ্গ দিতে আসছে না। ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু"। অবাকল বিষ্ময়ে উর্মিলা লক্ষ্ করল জগন্নাথের বিষ্ময়কর কথাগুলি। বিকেলে একসময় সে অন্তর্ধান হয়ে গেল ঘর থেকে। বাড়ি ফিরছে না দেখে উর্মিলার চিন্তায় পড়ে গেল। বেশ রাত্রে ছাতে ঘোরাফেরা করতে করতে যখন রৌশনারা বাগিচার বাদুড়গুলি আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল তখন দুটি ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করল সে। পার্কের মোড় পেরিয়ে এদিকেই আসছে। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা শুনে দরজা খুলল উর্মিলা; দেখল দাঁড়িয়ে আছে রেনকোট পরিহিত যশোবন্ত ও জগন্নাথ। নিগমবোধ ঘাটে ঘোরাফেরার সময় আগেই জগন্নাথের দেখা হয়েছিল যশোবন্তের সঙ্গে। কিন্তু আজ জগন্নাথ তাকে ধরে এনেছে নিগমঘাট থেকে, যাতে পালাতে না পারে। সে যশোবন্তকে বলেছে, 'এই তিনদন আপনি ভূতের মত বসে আছেন'। বাড়ি ঢুকেই জগন্নাথ উর্মিলার উদ্দেশে বলে "স্ফূর্তি করুন, খোশ গল্প করুণ। আমি এই সিঁড়িতে বসে পাহারা দিতে থাকব। কেবল ফিরে যাবার সময় এই পুরুষদের আমার ভাঙা টিনে দুই একটা সিকি ফেলে যেতে হবে। আমি সিঁড়িতে বসে কিন্তু পাহারা দিতেই থাকব।

বিশ্লেষণী পাঠ :

গল্পটির মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে দেশের রাজধানী শ্রেষ্ঠ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়া; সেই শিক্ষাব্যবস্থার শূণ্যতাও। বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা অন্তর্গতভাবে মানবতাহীন, হৃদয়হীন এবং কার্যক্ষেত্রে তারা সামজিকতার স্তরে কতটা নিরুৎসাহ ও কর্মক্ষমতাহীন সেই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এই গল্পে। দেশের যে 'গরিবিয়ানা' তাদের পাঠচর্চার বিষয় সেই গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের উপকার করার প্রশ্নে এই বুদ্ধিজীবীরা সবচেয়ে উদাসীন ও নিরাপদ থাকতে চায়। তাদের পরোপকারের ক্ষমতা মানসিকতা নেই আর সেই না থাকার মানসিকতাকেও তার যুক্তিপরম্পরায় সাজিয়ে বৈধ করতে চায় সমাজের কাছে। স্লাম এরিয়ার ছেলে জগন্নাথ। জগন্নাথকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন উর্মিলাদেবী। কিন্তু এই আশ্রয়দান উর্মিলাদেবীর কোনো সহকর্মী ভালভাবে নিতে পারেন নি। আবার অন্যদিকে

টিপ্পনী

দেখতে গেলে, একজন অসামান্য হৃদয়বান ও সংবেদনশীল নারী চরিত্রের মানবিকতাবোধ ও একাকীত্বকে উর্মিলাদেবীর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন ইন্দিরা গোস্বামী।

নাগরিক জীবনের ভারী একাকীত্বও এই গল্পের অন্যতম বড় বিষয়। এই একাকীত্ব আসে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ কতটা জনবিচ্ছিন্ন সেকথাও যেন লেখিকা এখানে পরোক্ষ বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। উর্মিলাদেবীর জীবনের বড় সমস্যা তার একাকীত্ব। সুযোগসন্ধানী বিবাহিত স্বামীর বিদেশে পলায়ন ও অন্য বিদেশিনীর সঙ্গে দিনযাপন ইর্মিলাদেবীর জীবনকে কঠিন করে তুলেছে। অর্থের অভাব নয়, মনের সঙ্গীর অভাব, একটা সংসারের অভাবই তার একাকীত্ব। সেই একাকীত্ব কাটানোর জন্য সে সর্বাদই সঙ্গী খোঁজে। কিন্তু তাদের মন জেনে যাবার পর উর্মিলাদেবীর বিশ্বাসভঙ্গ হতে থাকে। প্রেমের যথার্থ মূল্য উর্মিলা কখনোই পায় না। বিশ্বাসভঙ্গ হতে হতে সে জগন্নাথের মত স্লাম এরিয়ার ছেলেদের শিক্ষার আত্মনিয়োগকেই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ করে তুলেছে নিজের জীবনে।

জগন্নাথ ফিরে এসেছে উর্মিলার বাড়িতে কিন্তু খারাপ লাগার কথা সে শোনাতে ছাড়ে নি উর্মিলাকে। রাত-বিরেতে উচ্চশিক্ষিত একটি বাড়ির 'মজলিশ' সে কাছ থেকে দেখেছে। তার অর্থের কোনো অভা নেই; কিন্তু মনের অভাব আছে। সেই অভাব কে পূরণ করতে পপারে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলেছে আধ্যাপক ঠাকুর ও সাংবাদিক রূপচন্দ্রের মধ্যে। জগন্নাথ কিন্তু তার আশ্রয়দাত্রীর প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বস্ততা দেখিয়েছে। উর্মিলাদেবীর মনের একাকীত্বের কথা বুঝতে তার সময় লাগলেও সে একদিন বুঝেছে। জগন্নাথের এই বিশ্বস্ততা গল্পের শেষে এক অপূর্ব মাত্রা পেয়েছে। সে যেন এই 'মজলিশের' পাহারাদার হিসেব নিজেকে ভেবেই সন্তুষ্ট থেকেছে। এক বস্তির 'সব হারানো' জীবনের সঙ্গে এই উচ্চশিক্ষিত সব পাওয়া 'জীবনের শত যোজনের দুরত্ব। কিন্তু জগন্নাথ তার সেতুবন্ধ রচনা করে। তার মা অর্থের অনটনের জন্য ওভারসিয়েরের সঙ্গে চা-বিস্কুট খেতে যায়, অন্যদিকে উর্মিলাদেবী মনের একাকীত্ব ও এক টুকরো ছোট্ট সংসারের স্বপ্নে বিভোর থাকতে সঙ্গী খোঁজেন 'শিকারী'র মত। কিন্তু তার মর্মযন্ত্রণা হ'ল তার একাকীত্ব ঘোঁচে না কিছুতেই। শহরের বৈভবের মধ্যে যেন উলঙ্গ হয়ে থাকে মুখব্যাদান, একাকীত্বের অন্তর্গত স্বর।

পরশু পাতরের কুয়ো :

মূল গল্পের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণী পাঠ :

পরশু লক্ষীমপুরের এক বেকার যুবক যে অভাবী। লক্ষীমপুরের চৌমাথায় যে কয়েকটি ছেলে আড্ডা দিত তারা সকলেই এক এক করে নিখোঁজ হয়ে গেলও পরশু হয় নি। জঙ্গলের দিকে গিয়ে তারা অস্ত্র চালানো শেখে তারপর লড়াই শুরু করে রাষ্ট্রব্যবস্থার অনাচার ও বঞ্চনার

টিপ্পনী

বিরুদ্ধে। বাড়িতে অসুস্থ ভাইয়ের সঙ্গে মাকে একা রেখে পরশুর মন সরে না ওভাবে বাড়ি ছেড়ে পালাতে। এসব থেকেই তার স্বাভাবে 'ভীরুর' তকমা জোটে। অভাব অনটনের মধ্যে কিছু লোকের পরামর্শে সে ঠিকা কাজের বরাত নেওয়ার জন্য ঘুরতে থেকে লক্ষীমপুর থেকে গৌহাটির বিভিন্ন সরকারী অফিসগুলিতে। কখনো পি ডব্লু ডি, কখনও রেশম বিভাগ, কখনও মিলিটারি অথবা আর্মি সাপ্লাইয়ের অফিসের টেন্ডার নোটিশগুলি দেখতে থাকে সে।

একদিন সে গৌহাটি এসে জানতে পারল রেশম সঞ্চালকের দপ্তরে পলুপোকা রাখার জালিঘর তৈরির কাজের জন্য তিনটে টেন্ডার পড়েছিল। কাজটি একজনকে দেওয়া হলেও তাতে সম্পূর্ণ টাকা খরচ হয় নি। চার হাজার টাকা বাকি ছিল। সেই টাকার কাজের বরাত পেতে ঘোরাফেরা করছিল কয়েকজন হতদরিদ্র ঠিকাদার - যারা পরস্পরকে যেন ছিঁড়ে খেতে উদ্যত। জৈষ্ঠ্য মাসের গরমেদের মধ্যে বেলা দ্বিপ্রহরে লম্বা, রোগা, কালো পরশু তার একমাত্র সম্বল একখানি মাড়্গাডহীন সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিসের বাইরের বটতলায়। সকাল থেকে এক দানা খাবারও পেটে পড়ে নি; মাথার ওপর গনগনে সূর্য - কিন্তু দেখা নেই ইঞ্জিনিয়ার মশাইয়ের। অবশেষে এ ডি এস সাহেব বেরোলে পরশু পাতর তার ওপর একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ে কাকুতি-মিনতি প্রকাশের জন্য। লাইকুমেরির কুয়ো কাটার কাজের জন্য সে মরীয়া হয়ে পড়ে। সাহেবকে বাড়ির অবস্থার কথা বলে; ক্যাবনহশার রোগগ্রস্থ ভাই ও অসহায় মায়ের কথা শোনায়। কিঞ্চিৎ দয়াপরবশ হয়েই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলে "থাক থাক বুঝেছি। কিন্তু আর্নেস্ট মানি দেবাও তো সামর্থ্য হবে না। ..... বিল্ডিং এদের ক্ষেত্রে শিডিউল রেট যা আছে তাই। ১৯৯১ সনে এই রেট রিভাইজ্ড হয়েছে। কিন্তু স্যানিটারি ও জল জোগানের ক্ষেত্রে ১৯৮৪ সনের রেটই চলেছে। .... কাজ পেলেও সেই পুরনো রেটেই পাবে। আমি অবশ্য এখন কিছু বলতে পারছি না"।

অবশেষে লাইমেকুরিতে কুয়ো খোঁড়ার কাজের বরাতটি পায় পরশু পাতর। তার সহপাঠী জ্যোতি বা পবন, যারা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে চরাইপুঙের ক্যাম্পে গোপনে অস্ত্রশস্ত্রের শিক্ষা নিয়েছিল, কিংবা গহন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে কাচিন -এও গিয়েছিল, তারা পরশুকে নিয়ে খুব ঠাট্টা - তামশা করেছিল। মনে পড়ে পরশুর। বন্ধু ভোলার প্রেমিক বকুলের প্রতি পরশুরও গভীর প্রণয় ছিল। জঙ্গলের মধ্যে ভোলা ও বকুলকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল পরশু। পরশুকে দেখে ভোলা চেঁচিয়ে বলেছিল - " এই পরশু পাতর, আমাদের সঙ্গে চরাইপুঙে চলে আয়। বন্দুক হাতে না নিলে তোর নাতিপুতিও তোর মতোই এমনি খালি পায়ে বাউন্ডুলের মত ঘুরে মরবে"। বন্ধুদের এরকম চাপের মধ্যেও নিজের অসুস্থ ভাই ও মায়ের দিকে তাকিয়ে সে মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখায় নি।

"পরশু যায় কী করে? ভাই দামোদর গুয়াহাটির কালাপাহাড় হাসপাতালে।

মায়ের সঙ্গে গুয়াহাটি যাতাযাত করেই বেশিরভাগ সময় চলে যায়। এখন দামোদর কিছুটা ভাল, কিন্তু মাথার চুল পড়ে যাওয়ায় মন খারাপ করে বসে থাকে। কথাবার্তা বলা দুরের কথা, মুখ তুলে তাকায়ই না কারুর দিকে। মা খেতের ধান বেচে সামান্য যা হাতে পান তা ভাইয়ের জন্যই খরচ হয়ে যায়। গুয়াহাটির মামা সরকারি সাহায্যের জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনো কিছু হয় নি। তাই ভোলার মত তাড়াতাড়ি উধাও হয় কী করে? ভোলা ধিক্কার দিয়ে বলে গেল - ‘‘নির্লজ্জ, চাকরের মত খাটতে থাক’’

টিপ্পনী

কাজের বরাত পাওয়ার পর টাকার দরকার পড়ল। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের ঘরের সামনে লক্ষীমপুরের চক্রধর মণ্ডলের দেখা পেল পরশু। চক্রধর তাকে ১৯৮৫ সালের পুরনো রেটের কথা শোনায়; লেবার যোগাড়, তাদের খাওয়ানো, মজুরি, কুয়োর রিং থেকে অন্যান্য জিনিসপত্র কেনার জন্য ছ-সাত হাজার টাকার প্রয়োজনের কথা বলে। এত টাকা পরশু কোথা থেকে পাবে? ধার করা ছাড়া তার আর উপায় কী? কিন্তু কোথা থেকে এত দ্রুত ধার পাওয়া যাবে। ধূর্ত চক্রধর মণ্ডল তখন পরশুকে ডিব্রুগড়ের রহমত পাঠানের খবর দেয়। মায়ের অবশিষ্ট গহনা বন্ধক রাখার কথা বলে।

পরশু ও চক্রধর দুজনে মিলে একদিন পৌঁছয় রহমত কাবুলিওয়ালার কাছে। জোনাই মহকুমার লাইমেকুরি থেকে গোগামুখ আর দিখারি নদীর বস্তিগুলিতে রহমত পাঠানের দারুণ প্রতিপত্তি। তাকে সাহায্য করে একদল মাস্তান। রহমত কিন্তু পরশুকে দেখে টাকা ধার দিতে রাজি হয় না। তার বিশ্বাস হয় না এই রোগা পাতলা দুর্বল পরশু কাজ করে তার টাকা শোধ করে দিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত ধূর্ত চক্রধরের মধ্যস্থতায় পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজি হয় রহমত; দিখারির আশেপাশের লোকেরা যে হারে সুদ দেয় সেই হারে দেড় মাসের মধ্যে তাকে টাকা শোধ করতে হবে। বিল পাশ করানোর ব্যাপারেও দায়িত্ব নেয় চক্রধর - ‘‘হে, হে, কী যে বলো পাঠানবাবু। এ ডি এস এর সঙ্গে আমাদের ওঠাবসা, ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেও। বিল খালাস করতে আর কতক্ষণ!’’

টাকা পাওয়ার পর লাইমেকুরির উত্তরে সোমলতা বনের পাশের এক টুকরো জায়গায় কুয়ো খোঁড়ার কাজের জন্য গেল পরশু। জায়গাটা আগেরদিন ওভারসিয়ার মহাশয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রমিক, সাজসরঞ্জাম জোগাড়ের কাজে সাহায্য করল চক্রধর। প্রত্যেকের দিন মজুরি চল্লিশ টাকা। দুজন মিচচিং ও চারজন বিহারি শ্রমিক নিয়ে কাজে লাগল পরশু। সে নিজে রান্নাবান্না করবে ঠিক করল। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যেই গ্রামের একদল লোক শাবল, লাঠিসোটা নিয়ে হাজির হল প্রমাদ গুনল পরশু। চিৎকার করা তারা বলল - ‘‘তোরা চলে যা। বৃকোদর ও সহোদর এই দুই - ভাইয়ের জমি এটা’’। রেশম বিভাগ জমি নেওয়ার সময় সীমানার গন্ডগোল করে অনেকটা জমিই ফার্মের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই বিবাদ কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত গেছে।

সুতরাং এখানে কুয়ো খুঁড়তে দেওয়া হবে না"। শেষে তাদের তাড়া করল গ্রামের ছেলেগুলি; বেগতিক দেখে মিচিং শ্রমিক সরে পড়ল। পরশুকেও পালাতে হল।

দু'দিন পর ওভারসিয়ার এসে সোমলতার জঙ্গলের পশ্চিমে পুনরায় এক টুকরো জমি বেছে দিল। পরশু পুনরায় জঙ্গলদেবতার পুজো দিয়ে কাজ শুরু করল। প্রথমদিকেই ভালোই চলছিল। কিন্তু দু-ফুট খোঁড়ার পরেই শুরু হল ঝামেলা। রিং আর বসতেই চায় না। শুধু বালি আর পাথর। এদিকে শকুনের দৃষ্টি নিয়ে রহমান পাঠান ঘোরাফেরা করছে; বলছে - "এইভাবে বালু আর মাটির সঙ্গে কত যুদ্ধ করবি আর? ভেতরে পাথরের পাহাড় রয়েছে। উঠে আয়, উঠে আয়। মনে রাখবি, দু' মাসের মধ্যে আমার টাকাটা কিন্তু ফিরিয়ে দিতে হবে"। লাইকুমেরির ছেলেরাও বলতে লাগল, "কত কত লোক কোদাল শাবল ভেঙে মুখ চুন করে ফিরে গেল, এখন এই রোগা পাতলা ছেলেটা এসেছে কুয়ো খুড়তে ... হিঃ হিঃ"। পরশু'র মজুররা দুদিন খোঁড়ার পরেও অবস্থার কোনো হেরফের হল না। বালি ও আর পাথর বেড়েই চলতে লাগল। সাতটা রিং বসানোর পরেও যখন জল বেরোলো না তখন বিহারি মজুরটি নীচ থেকে ওপরে উঠে এল। ভরদুপুর পর্যন্ত পরশু মাটি খুঁড়েছে, নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত হয় নি। সকলেই অবাক বিস্ময়ে পরশুর এই গোঁয়ার্তুমি দেখছিল। সেসময় এক বয়স্ক বৃদ্ধ গোরু চরাতে সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে বিষয়টি অনুধাবন করে পরশুকে বলল - "যা ওভারসিয়ারের কাছে যা। তিনি আবার জায়গা বদলে দেবেন। এমন করে দেহপাত করছিস কেন ?" পরশুর মনে বাজল কথাটা। সে বলল -

> "আমি লাইকুমেরিতে খুঁড়েই ছাড়ব। আমি ফটফটে মিষ্টি জল বের করে দেখাব। জলদেবী আর জলদেবতা সাঁতরে বেড়ান যে জলে সেই টলটলে জল। আমি এখানে কুঁয়ো খুঁড়বো তো খুঁড়বই। দাদু তোমারা বাধা দিও না।"

ওভারসিয়েরে কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী নিয়ে যাবার সময় পথে রহমতের সঙ্গে দেখা হল পরশুর। তাকে দেখে ভয় হল পরশুর। অন্যদিকে বিকেলবেলায় হাফ প্যান্ট পরা ওভারসিয়ারবাবু এসে বালির স্তুপ দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল - "কী কান্ড ! এসব কী হচ্ছে ? পাঁচফুট খোঁড়ার পরেই খবর দেওয়া উচিৎ ছিল, তুমি দেখছি দশ ফুটই খুঁড়ে ফেলেছ। বিভাগ এভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে পারে না" পরশু বলতে লাগল "আমাকে বাঁচান আপনি। বাঁচান আমাকে"। অবশেষে একটা কিছু রফা হ'ল মজুরদের সঙ্গে ওভারসিয়ারবাবুর। জঙ্গলের পথে সকলে বাড়ি ফিরে গেল।

শৈলবালা এরপর পরশুর সাহায্যের জন্য এক সন্ন্যাসীকে লাইকুমেরিতে পাঠিয়ে দিল। সেই জটাধারী সন্ন্যাসীকে সকলে 'পানিবাবা' বলে ডাকত। একটি তিনকোনা লোহার ত্রিশুলের মত জিনিস নিয়ে সে মাটিতে খোঁচা মেরে জলের সন্ধান দিতেন। বেশ কিছু গাঁয়ে এভাবে তিনি

টিপ্পনী

জলের সমস্যা মিটিয়েছেন। জটাধারী 'পানিবাবা' যে জায়গাতেই তিনটে ডিগবাজি খেয়ে বলেন জল আছে সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিকেই রেশমবিভাগ নাকচ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত হাফপ্যান্ট পরা মোটাসোটা ওভারসিয়ার দই গ্রামের মাঝখানে সোমলতা জঙ্গলের কাছে একটি জায়গা চিহ্নিত করে দেন। তিনফুট রশি ঘুরিয়ে ছয়ফুট ডায়মিটারের জায়গা। সেই নির্দিষ্ট জায়গায় এবার পরশু তার লেবারদের নিয়ে কাজে নামল, তখন তার আর জলদেবতার কথা মনে পড়ল না; মনে পড়ল তার ক্যান্সার রোগগ্রস্থ ভাইয়ের কথা। "হায়, হায় ওর এই অবস্থা দেখেও সে এতগুলি টাকা ধার করে এই কাজে নামল। এটা কি উচিৎ হয়েছে তার ? নাকি মাইনা, যোগেশদের মত চরাইপুঙে গিয়ে বন্দুক হাতে নিলে ভাল হত"। যাইহোক, কাজ শুরু হলে একের পর এক রিং মাটিতে বসতে থাকল। বিহারি মজুররাও খুব খুশিমনে উদ্যম নিয়ে কাজ করতে লাগল। অতি গোপনে চালার তলায় বসে জলদেবরা কাছে প্রার্থনা করতে লাগল পরশু। রহমত পাঠান এখানেও এসে বলে গেল -

> "আমি সব কান্ডকারখানা দেখছি। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় দেখে রাখছি। তোর কুয়ো হবার কোনো আশা আমি দেখছি না। দুমাসের মাথায় টাকা ফেরৎ দিবি বলে কথা দিয়েছিলি। মনে রাখিস সইও করেছিলি তুই। রহমত সিং কাবুলিওয়ালাকে সবাই চেনে......"।

পরশুর বুকটা কেঁপে ওঠে। কাজ কিন্তু বিকেলবেলার দিকে আটকে যায়। অনেক খোঁড়াখুর পরেও আর রিং বসতে চায় না। মিস্ত্রিরা রাত কাটাতে জোনাইয়ের দিকে বাড়ির পথ ধরে। পরশু বসে থাকে লক্ষীমপুরের ভাওণা পার্টির সঙ্গে দেখা করার আশায়। তাদের কাছে ভাই দামোদরের খবর পাওয়া যাবে। ঘনজঙ্গলের মধ্যে জোছনা রাতের রূপোলি চাঁদ মায়া ছড়ায়। একসময় ভাওনা পার্টির হল্লা শোনা যায়। সোনাবাপ, হলধরেরা এসে 'মরা হাতির মত' পড়ে থাকা অসম্পূর্ণ কুয়োটা দেখে; তাদের স্বজন পরশুর কীর্তি। গান ধরে রাত্রিবেলা মৃদঙ্গ বাজিয়ে ; তারপর তাদের সঙ্গে জোনাই ফিরে যায় পরশুও। ভাইয়ের করুণ অবস্থান কথা তারা শুনিয়ে গিয়েছে। পরশুর মনে জেগে ওঠে দামোদরের মুখখানি; একসঙ্গে খেলাধূলো করে বড় হয়েছিল ওরা দুইভাই। এখন প্রিয় ভাইটি আর বাঁচবে না। হায় হায় সত্যি সে তা সহ্য করতে পারবে কি ?"

পরের দিন যথারীতি পুনরায় কাজ শুরু হয়। কিন্তু রিং আর বসছে না। কোনো গাছের শিকড়ের মত কিছুতে আটকে গেছে। অনেক কাটাকাটি করে শিকড়টা বের করা সম্ভব হল। দুধের মত সাদা রস বেরিয়ে এল। বাইরে সকলে তখন জলদেবতার উদ্দেশ্যে গান ধরেছিল -

"জলদেবতা জলদেবতা চাও চোখ খুলে
মুগবুটের ভোগ দেব
চম্পামালতীর মালা দেব
পূজব এলোচূলে
জলদেবতা জলদেবতা দেখ চোখ তুলে।"

আবার রিং বসতে শুরু করল। এভাবে এক সপ্তাহ ভালোই চলল। কিন্তু পনেরটা রিঙ বসার পরেও জলের নামগন্ধ পাওয়া এল না। বালতি বালতি লালামাটি, কালোমাটি বেরিয়ে আসতে লাগলল। পরশু মুষড়ে পড়ছিল। হঠাৎ একদিন গাদ বেরোতে শুরু করল। তা স্পর্শ করে ভাবল এটাই জল। পরশুর ইতিপূর্বে কুয়ো খোঁড়ার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সে পাগলের মত মিচিং লেবারগুলোর সঙ্গে মাটি কোপাতে শুরু করল। গায়ে যেন হাতির বল এসেছে। প্রায় তিনদন পর ফটফটে জল বেরিয়ে এল। রিংগুলিও খাঁজে খাঁজে বসে গেল। জলদেবতা ও জলরাণি যেন রহস্যময় খেলা খেললেন অসহায় পরশুর সঙ্গে। এরপর আশ্চর্যজনক ভাবে সেই কোমর পর্যন্ত জল হঠাৎ শুকিয়ে উঠল। বিহারি ও মিচিং মজুররা ভয়ে আর কুয়োর নীচে নামল না। শত আবেদন করেও পরশু তাদের কুয়োতে নামাতে পারল না। তখন সে নিজেই নিচে নেমে বালতি বালতি গাদ বের করতে লাগল। উপরে তাকালেই যেন সে দেখতে পাচ্ছিল রহমত সিং এর পাগড়ি। কুয়োর চারপাশে গ্রামের লোকসমাগম হয়েছিল। সকলেই পরশুকে 'চিড়িয়াখানার জন্তুর' মত দেখতে লাগল।

পরশুর এত পরিশ্রমের পরেও কিন্তু সপ্তাহের শেষে জল তিনফুটও হল না। এবার জল পরীক্ষার পালা। সরকারী সুপার সাইকেল চেপে এল জল পরীক্ষা করতে। কিন্তু একবালতি জল পরীক্ষা করে সুপারভাইজার বিপদেই পড়লেন। জল লাল, না তামাটে বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অবশেষে বললে "বুড়বক, এটা কুয়ো খোড়ার জায়গা নয়। এছাড়া ডিপার্টমেন্টের মাপের চাইতে অনেক বেশি খোঁড়া হয়ে গেছে"। কারুর কথায় কান না দিয়ে তিনি সাইকেল নিয়ে চলে গেলেন। মিচিং মজুরেরা বলল "এই যে পরশুদাদা, বালি ঢেলে দেখো তো; দু -ফুট মত বালি চালালে আবার ফটফটে জল আসবে"। এরপর চলল তিনদিন ধরে কুয়োতে বালি ফেলার পালা। তিনদিন পর সত্যিই কুয়োতে বেরিয়ে এল ফটফটে সুন্দর জল। পরশু প্রতীক্ষা করতে লাগল সুপারের সার্টিফিকেটের জন্য। কিন্তু সুপার এল না। পরশু অগত্যা কুয়ো থেকে জল বোতলে পুরে সুপারকে ধরার জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগল - কখনো গৌহাটি কখনো লাইকুমের। বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে পরশুর এই প্রাণপাত পরিশ্রমের পর কুয়ো থেকে জল বেরোনোর বিস্ময়কর কাহিনির কথা এত শোরগোল তুলে দিল যে সুপার শেষ পর্যন্ত আর না

এসে পারলেন না। শেষপর্যন্ত তিনি লালজল, সাদাজল কেটে শুধু জল লিখে দিলেন। পরশুর এবার কাজের বিল পাশ করানোর পালা। তার মনে পড়তে লাগল ভাই দামোদরের কথা। এই মাসে সে যদি বিলের টাকা পায় তাহলে মায়ের হাতে কিছু টাকা দিতে পারবে। ছোটবেলায় দুজনের স্কুলে যাওয়ার কথা ও দামোদরের পড়াশুনোর কৃতিত্বের কথা।

বিল পাশ করানোর কাজে জোনাই এর অফিসে যাওয়ার আগে ভাইকে দেখতে পরশু গেল লক্ষীমপুরে। দিখারি ও সিমেন নদীর সেতু পেরিয়ে, শিলাপাথর, ধেমাজি, গোগামুখ, চাউলখোয়া ঘাটের সুবনশিরির সেতু পেরিয়ে সে যখন লক্ষীমপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পা দিল তখন মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলজ্বল করছে। পথে চলতে চলতে সে খালের ধারে আবিস্কার করল একদল লোক দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে। ভিড় ঠেলে সে দেখল পুলিশের গুলিতে মৃত ভোলার ডেড্‌বডি। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার এতদিনের বন্ধু। ওদিকে আরেকটা মৃতদেহ সেটা বকুলের। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল ভোলা; বকুল ছিল তার প্রেমিক। কতদিন রাত্রের অন্ধকারে ভোলার বন্দুকের চকচকে নালটি দেখছে পরশু। সে বলেছিল একদিন - "কিরে পরশু, টিংটিঙে কাঠি হয়েই থাকবি নাকি? ঐ বিষাক্ত সাপের ডিম আনতে শিখে নে"। সাহসী, দুর্বার যৌবনের ডাক ছিল ভোলার। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তারা। ভুপেন ভরালী ওই ভিড়ের মধ্যে ফিসফিস করে বকুলের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগের কথা জানায়। সে নাকি বেশ কিছুদিন ধরেই ভোলাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। ক্রমশই লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল প্রান্তর। পরশু সেখান থেকে বাড়ির পথে এগোল। বকুলের কথা তার খুব মনে পড়েছিল - কারণ বকুলকে সঙ্গোপনে সেও ভালবাসত।

বাড়ি পৌঁছিয়ে মার সঙ্গে দেখা হল পরশুর। কদিন আগেই গৌহটি থেকে ফিরেছে দামোদরকে নিয়ে। ডাক্তররা তাকে ভেলোর নিয়ে যেতে বলেছে। দামোদর এখন প্রায় শয্যাশায়ী। কোনো কাজই করতে পারে না। তার খুব ইচ্ছে ছিল পরশুর কুয়োটা একবার দেখে। তা আর হবার নয়। পরশু ও শৈলবালা বসল আলোচনায় - কীভাবে কোন টাকায় এই চিকিঃসা করা যায়। এমন সময় চক্রধর মণ্ডল এসে হাজির হল। বিল পাশ করানোর জন্য কীভাবে ঘুষের ব্যবস্থা করতে হবে, কেমনভাবে টাকা বের করতে গেলে কমিশন দিতে হবে, সে কথা শোনাতে থাকে চক্রধর। রহমত পাঠানের টাকা শোধ করার বুদ্ধি দিতে গিয়ে সে বন্ধক রাখা সোনার বালাটি তাকে দেবার কথা পরশুকে বলে। টাকা ধার করার সময় মধ্যস্থতা তো সেই করে দিয়েছিল। অবাক বিস্ময়ে পরশু ভাবে কীভাবে তাহলে চিকিৎসার টাকা যোগাড় করবে? বাড়িতে দামোদরকে দেখতে আসে শম্ভুকুমার ও গ্রামের হাইস্কুলের চৌকিদার বলীরাম। তারা দামোদরের চেহারা দেখে আঁতকে ওঠে; ডাক্তারের পরামর্শ মত ভেলোর নিয়ে যাবার কথা বলে। পরশুকে বাহবা দেয় -

"শুনেছি, লাইকুমেরিতে তুই চল্লিশ ফুট কুয়ো খুঁড়েছিস। একসঙ্গে তিনদিন তার মধ্যে ঢুকে কাজ করেছিলি। এত তোর অধ্যাবসায় তুই অবশ্যই উন্নতি করবি। তুই খুব উন্নতি করবি।"

শৈলবালা অতিথিদের সামনেই কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে - "বড় বিপদ, বড়ো বিপদ আমাদের।"

বিল নিয়ে নানা কথা শোনার পর, রেশম বিভাগের পদস্থ অধীক্ষকের কাছে কুয়ো সংক্রান্ত বিভন্ন অভিযোগ জমা পড়া সত্ত্বেও পরশু টাকা পেল। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারকে ধরতে আধা রাস্তা ট্রাকে, আধা রাস্তা হেঁটে কীভাবে পরশু গৌহাটি পৌঁছল এবং সেখানে তিনদিন উপোষ করে থাকল - সেও এক বৃত্তান্ত। বিলের টাকা জোগড়ের এই ঘোরাঘুরি সময় গৌহাটিতেও দেখা হল গাঁয়ের আরেকটি নিরিদ্দেশ ছেলের সঙ্গে। সেও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে; এখন গা - ঢাকা দিয়ে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একসঙ্গে তারা মাংস ভাত খেল একদিন; ছেলেটি পরশুকে বলেছিল - 'তোদের হাড়মাংস খাবলে খাচ্ছে যে অফিসাররা, ওদেদর একটু দেখিয়ষে দিবি। গুলি করে উড়িয়ে দেব।"

অবশেষে টাকা হাতে পেল পরশু পাতর। কিছু টাকা কমই পেল চক্রধরের হিসেবের থেকে। তা থেকে হিসেব করে দেখল, ভাইয়ের ভেলোরের চিকিৎসার খরচ বাবদ যা লাগবে তা দিলে রহমত পাঠানের কর্জের টাকা শোধ হয় না। ভেবেছিল তার টাকা শোধ করে মায়েদর গয়না ছাড়িয়ে সেটা পুনরায় বন্ধক রাখলে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু চক্রধরের পরিকল্পনায় সেটাও সম্ভব হচ্ছে না। খুব চিন্তায় পড়ে গেল পরশু। তার মনে হচ্ছিল যে - কোন সময় রহমৎ সিং দাঁত নখ নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ওদিকে রহমত সিং আগামী মাসে বাড়ি যাবে; তার ভাইকে নাকি কেউ গুলি করে মেরেছে। হিংস্র হয়ে উঠেছে রহমৎ সেই খবর পেয়ে।

কিন্তু তেমনটা হল না। একদিন বিকেলে রহমত পাঠান তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে তার বাড়ি এল। সকলেই তটস্থ হয়ে উঠল। দামোদরের কেমোথেরাপি চলছে এ খবর তার কাছে ছিল। জাতিতে বিধর্মী বলে রহমতের মনে সন্দেহ ছিল বাড়িতে তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে কিনা। পরশুকে জিজ্ঞেস করে ঘরে ঢুকে দামোদরকে দেখল সে, তারপর বাইরে এসে আকাশের দিকে হাত তুলে কী যেন আওড়ালো; তারপর পকেট থেকে রুমালে বাঁধা শৈলবালার বন্ধক রাখা গহনা বের করে পরশুর হাতে দিল এবং বলে গেল -

"নে তোর গয়না। আর শোন আমার কাছে যে টাকা নিয়েছিলি, এখন তা দিতে হবে না, ভালো করে ভাইয়ের চিকিৎসা কর। আরে ভাই তো

টিপ্পনী

খোদাকে নিয়ামত হোতা হ্যায়। .... ভাই হ্যায় তো জাহান হ্যায়। বড়ে সৎ কর্মসে ভাই মিলতা হ্যায়। খুব করে চিকিৎসা কর। খুব ভালো করে ......।”

তারপর সাইকেল করে চলে যায় রহমৎ সিং পাঠান।

বিশ্লেষণী পাঠ :

গল্পটি ইন্দিরা গোস্বামীর অন্যতম সুলিখিত গল্প বলে পরিচিত। এই গল্পে পরশু পাতর এক সাধারণ নিম্নবিত্ত গ্রামের মানুষ। সরকারি সুযোগ সুবিধা ও ব্যবস্থাগুলি কীভাবে দুর্নীতির পাকেচক্রে সাধারণ মানুষকে জড়িয়ে ফেলে সেকথা পরশুর কুয়োখোঁড়ার বরাত পাওয়া নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার থেকে রেশম বিভাগের অধীক্ষক, সাধারণ কেরানি সকলেই মোসায়েবি ও কাট্‌মানি বা ঘুষতন্ত্রের অংশ হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের ট্রাজেডি হল সেই পাকেচক্রে আবর্তিত হওয়া। পরশু তার বন্ধুদের মত সন্ত্রাসবাদীদের দলে কিংবা রাষ্ট্রবিরোধীদের দলে ভিড়ে যায় নি, চেয়েছে সৎভাবে রোজগার করে মা ও ভাইকে নিয়ে সাধারণ জীবন যাপন করতে। ভাই এর ক্যানসার ধরা পড়ার পরে তার চিকিৎসা চালাবে কেমন করে। মায়ের গহনা বন্ধক রেখে সে কুয়ো খোঁড়ার বরাত পাবার জন্য ‘আর্নেস্ট মানি’ জোগাড় করেছে। কোনো সরকারি ছাড় সে পায় নি। রহমত খানের মত দুর্ধর্ষ কাবুলিওয়ালার কাছে টাকা ধার করতে হয়েছে তাকে। তবুইও শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয় নি। কুয়ো খোঁড়ার বিল পাওয়ার পোর সে দেখেছে খুব কম টাকাই আর অবশিষ্ট আছে ভাই এর চিকিৎসা করার জন্য।

গল্পে পরশুর পৌরুষদীপ্ত কর্মদ্যোগ একটি কুয়ো খননের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে। লাইকুমেরিতে কুয়ো সে খুঁড়বেই। এ ছিল সকলের চোখে পরশুর পক্ষে সাধ্যাতীত পণ। কিন্তু সে তা করে দেখিয়েছে। একদিকে ভাই এর চিকিৎসার টাকা যোগাড় করা অন্যদিকে মা’কে নিয়ে ছোট্ট সংসার টিকিয়ে রাখা - এই দ্বিবিধ বাঁচার তাগিদ তাকে ভর করেছে। কুয়ো খননের মধ্যে, মাটি থেকে স্বচ্ছ ফটফটে জল বের করার তাগিদ যেন তাকে এক অসম লড়াইতে নামিয়ে দিয়েছে প্রকৃতির ববিরুদ্ধে। পাথুরে মাটির বুক ফাটিয়ে জল সে বের করবেই - এই তার প্রতিজ্ঞা। প্রথমবার তাদের ভাগিয়ে দিয়েছে গ্রামের লোকেরা; দ্বিতীয়বার জমি পড়েছে পাথুরে মাটির। অনেক বেশি পরিশ্রম করে সে কুয়ো খুঁড়েছে, জল বের করেছে মাটির তলা থেকে। এই অতিরিক্ত খননের জন্য সরকার তাকে কোনো পয়সা দেয় নি। লোকসান হয়েছে তার মজুরিতে। তবু শেষ পর্যন্ত সে জয়ী হয়েছে। পরশু’র দুর্দমনীয় জেদই তার পৌরুষের অহংকার হিসেবে পরিস্ফুট হয়েছে। পরশু কখনো ভাবেনি সে রহমৎ পাঠানের টাকা চোট করে দেবে। শীর্ণকায়, কৃষ্ণবর্ণের পচরশুকে দেখে রহমৎ তো টাকা ধারই দিতে চাইছিল না। শেষে অন্য জাতের মানুষ হয়েও রহমৎ পরশুর ভাই এর চিকিৎসার জন্য তার ধার মুকুব করে দিয়েছে। যে

সুযোগ তাকে রাষ্ট্র দিতে পারে নি সেই সাহায্য তাকে করেছে বিধর্মীয় রহমৎ পাঠান। তার ভাই সুদুর দেশে মারা গেছে বন্দুকের গুলিতে; তবুও পরশুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে নি, বরং নিজের ভাই এর ভাল করে চিকিৎসা করার কথাই বলেছে। এখানে জাতি বর্ণের ঊর্ধে এক মানবিক সম্পর্কেদের টান গল্পটির পরিণতিকে অসাধারণ করে তুলেছে।

লক্ষীমপুরের চক্রধরের মধ্যস্থতায় পরশু পাঁচ হাজার টাকা ধার পেয়েছে। মধ্যস্থতাকারী চক্রধর ধার শোধ করার সময় পরশুর বন্ধক রাখা সোনার বালা হাতিয়ে নেবার ফন্দিও এঁটেছে। এক দালাল চরিত্রের সমস্ত গুণাবলী তার মধ্যে রয়েছে। গ্রামসমাজে সাধারণ মানুষের ঋণজালে বন্দী হবার পেছনে এই চক্রধরদের বড় ভূমিকা থাকে। ইন্দিরা গোস্বামী তাঁর গল্পে অসমের গ্রামীণ সমাজের বিশ্বস্ত ছবি এই গল্পে তুলে ধরেছেন। সেই সমাজের মানুষ, অপূর্ব ভৌগোলিক পরিবেশ ও সৌন্দর্য, তার গান, নিম্নবর্গীয় জীবনের লাঞ্ছনা বঞ্চনার ইতিবৃত্ত হয়ে ওঠে তার গল্প।

সংস্কার

মূল গল্পের বিশ্লেষণী পাঠ :

ইন্দিরা গোস্বামী রচিত 'সংস্কার' গল্পটি তার অসাধরণত্বের কারণে বহু পঠিত ও বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় গল্পের একটি বীশেষত্ব হল, ভারতীয় সমাজব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত সামাজিক ও সংস্কৃত সংস্কারগুলির তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যিক প্রকাশ। ভারতবর্ষীয় সমাজ বহুমাত্রিক ও জটিল; বহুভাষিকতার প্রেক্ষাপটে সেই জটিল ও বিভিন্নতাচর প্রকাশ আমরা দেখতে পাই আধুনিক ভারতীয় গল্প - উপন্যাসে। অসম প্রদেশের সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা, ইতিহাস, মিথ, জীবনচর্যার সুনির্দিষ্ট উপকরণগুলির উদ্ভাসন খুঁজে পাওয়া যায় ইন্দিরা গোস্বামীর সাহিত্যে। তাঁর 'দাঁতাল হাতির উইয়ে খাওয়া হাওদা' কিংবা 'ছিন্নমস্তার মানুটহ' ইত্যাদি উপন্যাসে সুদীর্ঘকাল ধরে ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে প্রবাহিত অসমীয়া জনজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মিথ, ইতিহাস, লেজেন্ডস্, সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা স্থান করে নিয়েছে। গল্পগুলিচর মধ্যেও সেরকম বিষয় অনুষ্যুত হয়ে আছে।

'সংস্কার' গল্পটি এক গ্রামের মহাজন পীতাম্বরের বংশের উত্তরাধিকার অনুসন্ধানের গল্প। এমন উত্তরাধিকার যে তার কাঞ্চনকৌলিন্যকে রক্ষা করবে, তার সম্পত্তির ভাগীদার হবে। নিঃসন্তান মহাজন পীতাম্বরের সন্তান প্রার্থনার সূত্রে এসে পড়ে বিধবা দময়ন্তীর 'পেট ভাড়া নেবার' প্রসঙ্গ, সঙ্গে অশরীরী আকর্ষের বর্ণমালা। কিন্তু দময়ন্তী শান্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ভাগ্যের বিঢ়ম্বনায়, স্বামীর মৃত্যুর পর সে অসহায়, আশ্রয়হীন তার সাত - আট বছরের কণ্যাকে নিয়ে। অর্থের প্রয়োজনে শরীর ব্যবহার প্রয়োজন হয়েছে তার। যজমানি বামুনের মেয়ে হিসেবে

টিপ্পনী

নীচুতলার শুদ্রের সঙ্গে শরীর ব্যবহারে চরম মানসিক আপত্তি তার। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় মা-মেয়েকে এই সমাজে দেখবে কে ? তাই অর্থের বিনিময়ে মহাজন পীতাম্বরের কাছে শরীর বিক্রিতে রাজি হয়ে যায় সে ল কিন্তু পীতাম্বরের ঔরসে সন্তান ধারণ সে কিছুতেই করতে পারে না। ফলে পেটে আসা সন্তানকে নষ্ট করে ফেলে সে, যেমন এর আগে আরো তিনবার সে করেছে। অর্থের চাহিদা, আশ্রয়ের চিন্তা অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে সে শরীরকলে বাজি রাখতে পারে কিন্তু রক্তের সম্পর্কে ভালবাসার কোনো স্থান নেই। সম্পর্কটি তৈরি হয়েছে একমাত্রিক ভাবে পীতাম্বরেদের দিক থেকে। শুধুমাত্র নিজের সন্তানহীনা রুগ্না শয্যাশায়ী স্ত্রী'র অপারগতা থেকে দময়ন্তীর প্রতি আগ্রহ জন্ম নিয়েছে। তার গোলা ভর্তি ধান, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী কে হবে? কীভাবে সে রক্ষা করবে বংশকৌলিন্য? কে পরবে পিতার রেখে যাওয়া অস্থিহাড়? এসব চিন্তা থেকেই তার মনে সন্তানকামনার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বিধবা দময়ন্তী পীতাম্বরের সন্তানের ভ্রুণ অবলীলায় নষ্ট করে ফেলছে নিজের বংশকৌলিন্যের কথা ভেবে। সুতরাং সামাজিক জল - অচল বর্ণ বিভাজন যা একটু আলগা হয়েছিল কাঞ্চনকৌলিন্যের কারণে তা আবার সমান্তরাল সামাজিক দুরত্বে সুস্থিতি পায়; উত্তরাধিকার অনুসন্ধানের অলঙ্ঘনীয় ট্রাজেডি।

টিপ্পনী

সমালোচনাত্মক পাঠ :

দময়ন্তী গল্পটির মধ্যে নারী হিসেবে দময়ন্তীর অবস্থানকে খুব জোরালো ভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছেন ইন্দিরা গোস্বামী।এই গল্পে সুন্দরী দময়ন্তীর প্রতি পীতাম্বরের আকর্ষনকে শুধুমাত্র পুরুষের কামনা - বাসনার বর্ণমালায় দেখা হয় নি ; নারী হিসেবে দময়ন্তীর বর্তমান অবস্থার ফের এবং অতীত বংশমর্যাদার প্রতি তার অনুভবের দৃষ্টিভঙ্গিটিকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দময়ন্তীর মা ধনশ্রী নদীপারের রৌতার মেয়ে; ওখানকার বামুন মেয়েদের মত সুন্দরী ভূ-ভারতে কোথাও নেই বলেই ভাবল সে। দময়ন্তীর পিতা পূর্ণানন্দ ছিলেন পুরোহির; মাইসানপুর, গর্গরা অঞ্চলে ছিল তার অসংখ্য যজমান। কীভাবে রৌতার মেয়েকে পূর্ণানন্দ বিবাহ করেছিলেন সে কাহিনিও সংক্ষেপে বলা হয়েছে এখানে। একবার একজোড়া আলের বলদ হারিয়েছিল পূর্ণানন্দের। তার নিজের হালও ছিল তখন; কিন্তু বলদ হারানোয় সে খুঁজতে খুঁজতে ধনশ্রী নদীর পারে একেবারে রৌতায় পৌঁছে গিয়েছিল পূর্ণানন্দ। রৌতার ভাগ্যতী মেবের সঙ্গে তখই তার বিবাহ ঠিক হয়। ইতিপূর্বে ওই অঞ্চলের কোনো যজমানি বামুন এতদুরে এসে বিয়ে করেনি। সেই ব্রাহ্মণ যজমানিদের মর্যাদা রক্তে মিশে আছে দময়ন্তীর, রূপে প্রচ্ছায়া আছে রৌতার নারী তার মা'য়ের। আজ অভাবে পড়েছে সেই নারী; কিন্তু দেহ বিক্রি হয়ে গেলেও কীলমর্যাদা, বংশের ব্রাহ্মণ্যবাদী মর্যাদাবোধ তার নারীত্বকে অন্তর্গতভাবে সাহসী করে তুলেছে।

মনের এই অহমিকার প্রকাশ ঘটেছে তখনই যখন সে কৃষ্ণকান্তকে বলেছে পীতাম্বর সম্পর্কে - ‘‘ব্যাটা শুদ্র মহাজনের এমন বুকের এমন পাটা। আমি যে যজমানি বামুনের মেয়ে একথা জানে না ও ? কিন্তু অভাবের তাড়নায় পৌনপুনিক দেহবিক্রিতে আজ ক্লান্ত সে, পীতাম্বর মহাজন যদি তাকে হোমযজ্ঞ করে পঞ্চায়েতের আশীর্বাদ নিয়ে বিবাহ করে তাহলে তো এই জলে ভেসে যাওয়া অবস্থা থেকে সে মুক্তি পায়।

একের পর এক অবৈধ শারীরিক সঙ্গম তার গর্ভে জন্ম নেওয়া ভ্রূণকে দময়ন্তী হত্যা ককরেছে এবং বাঁশবাগানে পুঁতে রেখেছে। শুধুমাত্র অর্থাভাবের তাড়নাই তাকে পুরুষসঙ্গ অভিলাষে এগিয়ে দিয়েছে। ‘‘আজকাল শরীরেও ধরেছে কাউকে আশ্রয় করে থাকতে পারলে ভালোই হবে’’। গোটাগ্রামের কেউ তাকে আর ডাকে না। অধিকারীর বাড়িতে চিড়ে কোটার কাজও বন্ধ, কারণ সে চিড়ে কুটলে কেউ খায় না। গ্রামের বামুনদের বাধায় পৌতে কাটার কাজ বন্ধ। সাতখালির আটবিঘে তার নিজের ভাগের জমির পাঁচমন ধান এখনো কেউ দিতে আসে নি । দুই মেয়েকে নিয়ে কীভাবে সংসার চলবে তার সে বুঝতে পারে না। চাতরা গুড়ির যে বামুনের ছেলেটি তার শরীর ভোগ করেছে তার থেকে অনেক সম্পন্ন পীতাম্বর, তার আশ্রয়ের জায়গা সে দিতে পারে। এইসব ভেবেই সে রাজি হয়ে যায় ; পীতাম্বরকে ডাকে পূর্ণিমার রাতে ঢেঁকিশালে। শারীরিক মিলন হয় দু’জনের।

দুমাস পর কৃষ্ণকান্ত পুরোহিত জানতে পারে দময়ন্তী অন্তঃসত্ত্বা। একজন নারী হিসেবে এই সন্তান জন্ম অন্তর্দ্বন্দ্বে চৌচির হতে থাকে দময়ন্তী। একবার ভাবে বর্নবিভাজনের এই সংস্কারের কথা ভেবে কী হে, সে সংস্কারের ঐতিহ্য মর্যাদা তো তাকে আশ্রয় দেয় নি, মুখে খাবার তুলে দেয় নি। পরক্ষণেই শুদ্রের ঔরসে ধারণ করা সন্তানের পাপ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় জন্মগত সংস্কারের কুঠুরির মধ্যে। ইন্দিরা গোস্বামী এই অন্তদ্বন্দ্বের ছবি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন। নারী হিসেবে সন্তানধারণের অনন্য অভিজ্ঞতাকেও দময়ন্তীর মধ্যে দেখিয়েছেন। নারীর শরীর হিসেবে ব্যবহৃত হলেও দময়ন্তীর স্বাধীনতা আছে মানুষ হিসেবে, অধিকার আছে শরীর বিক্রি করে বেঁচে থাকার, শরীরের আকর্ষণ আছে তার টানও - কারণ সে পূর্ণ যৌবনা নারী, একজন মা, সর্বোপরি তার না - গ্রহণ বা বর্জনের অধিকারও আছে। দময়ন্তীর এই স্বাধীন মানসিকতার অপূর্ব প্রকাশ গল্পটির মানবিক আবেদনকে ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করে। কাঞ্চণকৌলিন্য যেমন বর্ণকৌলিণ্যকে অসার করে দেয় ক্ষেত্রবিশেষে, তেমন ভারতবর্ষীয় সমাজে বর্ণকৌলিন্যের ভয়ঙ্কর খাদগুলি ব্যাক্তির মনোগঠনের কোন স্তর পর্যন্ত শিকড় গেড়ে বসে আছে তা সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় এখানে।

পীতাম্বর:

পীতাম্বর মহাজনের বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। একসময়ের শক্ত - সমর্থ জোয়ান পীতাম্বর এখন ক্রমশই বয়সের ভার টের পাচ্ছেন। নিঃসন্তান পীতাম্বরের একমাত্র দুঃশ্চিন্তা তার বংশপরম্পরা নিয়ে এত পরিশ্রমে তিল তিল করে তৈরি করা মহাজনী সম্পত্তির উত্তরাধিকার তাহলে কে হবে? প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে সে; কিন্তু দ্বীতীয়া স্ত্রী'র বাত - পিত্তের সমস্যা, রুগ্না, শয্যাশায়ী । এই স্ত্রীর জন্য যে সে কিছু করেনি তা কিন্তু নয়। প্রাব কুড়িবার দেখিয়ে এনেছে গৌহাটির হাসপাতালে। কিছু হয় নি আই অস্থি - চর্মসার মহিলার। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নির্বাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকা বাদে তার বিশেষ কোনো কাজ নেই। দ্বিতীয় বিবাহের পর থেকেই পীতাম্বর নিজের এহেন ভাগ্যবিড়ম্বনার হতাশ এবষং অস্থির। বাড়ির সামনে বসে সে বাচ্চাগুলোর খেলাধূলা দেখতে দেখতে তার মনে সন্তানের আকাঙ্খা পুনরায় জাগরুক হয়। স্ত্রী'র প্রসঙ্গে পুরোহিত কৃষ্ণকান্তের কথা তার হৃদয়ে আলোড়ন তোলে - "তবে তো আর সন্তানের কোনো আশাই নেই। তাই নয় কি? বড় দুঃখের কথা, তোমার তো বংশই রইল না আর"। নতুন বিবাহের কথা ভাবতে বলেন কৃষ্ণকান্ত। এই সময়ই ব্রাহ্মণের বিধবা স্ত্রী দময়ন্তীর প্রতি আকর্ষণ নতুন করে আবিষ্কার করে পীতাম্বর। অকাল বৈধব্যের পর যৌবণাবতী দময়ন্তী গ্রামের সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভাবের কারণে তাকে পতিত হতে হয়েছে। অনেকেই ভোগ করে গেছে তার অটুট যৌবনের আনন্দ; কখনো মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, কখনো সাতামপুরের বামুনের ছেলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ব্রাহ্মণের স্ত্রী হোক না পতিত। পীতাম্বরের মধ্যে জন্ম নেয় আশা, যদি সে বিবাহ করতে পারে দময়ন্তীকে। পুরোহিত কৃষ্ণকান্তকে মধ্যস্থতার আর্জি জানায় সে। সুযোগের সদব্যবহার করতে কৃষ্ণকান্তও পিছপা হয় না। এই সুযোগে সে একের পর এক বকশিস হাতিয়ে নিতে থাকে।

বিগতযৌবনা স্ত্রীর সান্নিধ্যে বছর পঞ্চাশের পীতাম্বরের জীবনকে পানসে লাগে। একদিকে বংশের চিন্তা অন্যদিকে দময়ন্তীর যৌবনের আকর্ষণ তার মনে নতুন আশা আকাঙ্খার জন্ম দেয়। পুরুষসিংহ বলিরাম মহাজনের পুত্র পীতাম্বর পুরোহিতের কাছে নতজানু হয়ে বলে - "বাপু আমার আশায় যেন কুঠারাঘাত না হয়। আমার পিতৃ - পিতামহ যে পুরুষসিংহ ছিলেন সে তো তুমি জান। বংশধর না থাকার মনকষ্ট একমাত্র ভুক্তভোগীই জানে। শুধু কি তাই, এই কুহকিনী বামুনের মেয়ে আমার জীবনটা যে হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছে ল আমি কি করব?" কৃষ্ণকান্তের প্রস্তাবে দময়ন্তী রাজি হতে বাধ্য হয়। তার বাধ্যতা বর্তমানের আশ্রয়হীনতা ও অভাবের তাড়না থেকে উঠে আসে। অর্থের প্রয়োজন তার খুব। দুই কন্যাকে নিয়ে জীবন সংগ্রামে বাঁচতে হবে তাকে। তাই শুদ্র মহাজনের বিবাহ প্রস্তাব মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও পূর্ণিমা রাত্রে দময়ন্তীর ঢেঁকিশালে আমন্ত্রিত হয় পীতাম্বর। সেগুন বন পেরিয়ে শিংরা

টিপ্পনী

নদির পোলের কাছে দময়ন্তীর বাসা। গ্রামের নির্জন প্রান্তে মাত্র চারঘর সত্রের লোক সেখানে থাকে। সেখানে গভীর রাত্রে উপস্থিত পীতাম্বর। তাদের ঘনিষষ্ঠ মুহূর্তে দময়ন্তী প্রথমেই জেনে নেয় : "টাকা পয়সা এনেছ তো ?" তখন পীতাম্বর বলে "আমার যা আছে সবই তোমার" ।। উভয়ের শারীরিক মিলন হয়। অর্থের বিনিময়ে শরীর বিক্রি কোনো নতুন বিষয় নয় দময়ন্তীর কাছে। একের পর এক দেহদানে সে অন্তসত্তা হয়েছে কয়েকবার, এবং সেই পাপের ভ্রূণ হত্যা করে বাড়ির পাশের বাঁশবনে পুঁতে রেখেছে। কিন্তু পীতাম্বরের সঙ্গে শারীরিক মিলন সে মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। তাকে নদীতে স্নান করতে দেখে কৃষ্ণকান্ত বলেছে - "আগে দুধনৈ বাজারের বামুনের ছেলেরা তো তোর কাছে আসত যচেত। কিন্তু ওরা চলে যাওয়ার পর তো তুই এভাবে স্নান করতে আসতিস না দময়ন্তী"। নিরুত্তর দময়ন্তীর ইশারা থেকে কৃষ্ণকান্ত বুঝতে পারে 'এ সন্তান পীতাম্বরের', চতুর্থ বর্ণের মহাজনের ঔরস ধারণ করেছে দময়ন্তী। পীতাম্বরকে সে সংবাদ দিয়ে কৃষ্ণকান্ত পুনরায় আদায় করে নেয় কুড়ি তাকা বক্‌শিস।

ইতিপূর্বে দময়ন্তী তার গর্ভের ভ্রূণ চারবার নষ্ট করেছে। গ্রামের এক বুড়ি গাছের জড়িবুটি দিয়ে সেকাজে তাকে সাহায্য করে। একথা সকলের কাছেই জানা।এবারও সেই ভয় আছে। পীতাম্বর গলবস্ত্র হয়ে তাই কৃষ্ণকান্তকে বলেছে - "বাপু তুমি এই উপকারটুকু করে দাও। নইলে তোমার পাপ লাগবে। ও যে রাত্তিরে পিদিমের আলোয় 'নষ্ট কিছু' পুঁতে রাখতে যাব, সত্রের সকলেই জানে। আমি ও জানি। কিন্তু ও তো বামুনের বৌ গো, আমি ওকে মাথায় রাখব"। নষ্ট বামুনের বিধবা বৌ'কে বিবাহ করতে পীতাম্বরের মনে কোনো গ্লানি নেই; বরং সে স্বপ্নে দেখতে থাকে দময়ন্তীর গর্ভে তার নিজের সন্তান ক্রমশই বড় হচ্ছে। শিশু থেকে তরুণ হয়ে পীতাম্বরের হাত ধরে ধনশ্রী নদীর তীরে তীরে সে ঘুরে বেড়ায়; যেন "যুগযুগান্তরের বংশপরম্পরায় এক সোনালি রজ্জু টেনে নিয়ে চলল সীমাহীন দিগন্তে - যেখানে স্বর্গমর্ত্য একাকার হয়ে গেছে, যেখানে সব রং একাকার হয়ে আছে, যেখানে সব রং মিলেমিশে আলোর উদ্দেশে ছুটে চলেছে"।

এই স্বপ্নযাপন পীতাম্বরের অবচেতন মনের প্রকাশ। অসম্ভব সেই স্বপ্নই তার ট্রাজেডি হয়ে যায় গল্পের শেষ পর্যায়ে।পাঁচমাস হলেই আর সেই ভ্রূণ নষ্ট করা যায় না, সেকথা পীতাম্বর জানে। নিজের অবচেতনে সে শুনতে পায় দময়ন্তীর কথা - 'হোমের ব্যবস্থা কর মহাজন, দেখছো না আমার পেটটা কেমন ভারী হয়ে উঠেছে'।

নিজের সন্তান, নিজের বংশের পরম্পরাকে রক্ষার ব্যক্তিক তাগিদ থেকে পীতাম্বরের চেতনায় প্রশ্ন জেগে ওঠে স্পপৃশ্যতা - অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে, ধর্মের সংকীর্ণতা সম্পর্কে; উত্তরও সে নিজের পেয়ে যায় - "উঃ এইসব শূদ্র, বামুন, মুসলমান বিচার অনর্থক। আমরা তো মানুষ চাই, - কাটলে রক্ত বেরোয় এমন রক্তমাংসের মানুষ"। গল্পকার পরিবর্তিত সময়ের একটা

টিপ্পনী

আবহাওয়াকে গল্পের শুরু থেকেই ব্যবহার করেছেন।

গ্রামসমাজে সংস্কারের চিত্রণ : পরিবর্তনের ছবি

দময়ন্তীর শরীরী যৌনতাকে ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে তার নষ্ট বৈধব্য এবং গ্রামের বামুনসন্তানদের সঙ্গে তার সম্পকএর কথা ও উল্লিখিত হয়েছে। বলা হেয়েছে দময়ন্তীর জন্য সদিলা বামিনদের নাক কাটা গেছে, মাছ খাওয়া এহেন বিধবা মাড়োয়াড়ি থেকে সাতারামপুরের বামুনের ছেলে সকলেই এসেছে তার কাছে যৌবনের আনন্দ নিতে। রংমিলা মেছুনির কাছ থেকে ধানের বিনিময়ে দময়ন্তীর ফলুইমাছ নেবার খবর পেয়েছে পীতাম্বর। কৃষ্ণকান্তের কাছে এসব শুনে পীতাম্বর বলেছে - 'চুপ করো পুরুতমশাই। বামুনের বিধবার মাছ খাবার কথা রাষ্ট্র করার প্রয়োজন কী? আজকাল চলছে। উত্তর পাড়া থেকে দক্ষিণ পাড়া কোথাও বাদ নে্। আর দোষই বা কী? এইসব নিয়মকানুন উঠে যাওয়াই দরকার''। সময় পরিবর্তনের আরও ইঙ্গিত গল্পের শুরুতে ধরিয়ে দিয়েছেন লেখিকা। সংস্কৃত উচ্চারণের শুদ্ধতার প্রশ্ন ধরে যেন এসেছে ব্রাহ্মণের অবক্ষয়ের প্রশ্নটি তেমনই এসেছে সামাজিক আচার - বিচার প্রথার ক্রমাবলুপ্তির কথা। মহাজন শুদ্র হলেও গ্রামে ব্রাহ্মণ বাদে তারই জুতা পরার অধিকার। পুরোহিত কৃষ্ণকান্তের মুখেই ধরা পড়েছে সেইসব সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতগুলি -

> "ওই তো সেদিন আমাদের পুরানো যজমান মহিকান্ত শর্মার দুই ছেলে কামখ্যায় গিয়ে পৈতে নিল। মাইসানপুরের যজমান সূর্য শর্মা তার বাপ - মা দুজনের শ্রেদ্ধ একসঙ্গে সারল। বিয়ে টিয়েতে ধীরে ধীরে অনেকেই নয় পুরুষের শ্রাদ্ধ পতিত ফেলতে শুরু করেছে। এ ছাড়া চুয়ানি, কর্ণবেধন, পুহন বিহা, নামকরণ, গৃহপ্রবেশ, বাসন্তীপূজা, ঘরে শকুন পড়ার হোম ইত্যাদি উঠেই যাচ্ছে। পইতে খুললে আগে প্রায়শ্চিত্ত করার নিয়ম ছিল। এছাড়া এখন কটা বামুনের ছেলে গায়ত্রী জপ করে বলো?"

এই পরিবর্তিত সময়ের পটে দময়ন্তীর ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সঙ্গে পীতাম্বরের মহাজনি কাঞ্চনকৌলিন্যের সংঘাত। ক্ষয়িষ্ণু ব্রহ্মণ্যতন্ত্রের শিকড় মানুষের মনের কত গভীরে প্রোথিত সেটাও উপলব্ধি করা যায় গল্পের পরিণতিতে।

তিনমাস পার হয়ে গেলে এক ভাদ্রের সন্ধ্যেবেলায় ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে পীতাম্বর জানতে পারে দময়ন্তী এবারও তার গর্ভের সন্তান নষ্ট করে ফেলেছে; ভ্রূণ নষ্ট করে পুঁতে ফেলেছে বাড়ির পিছনের বাঁশঝাড়ে। কৃষ্ণকান্ত তাকে যখন বলেছে - "ওঁ নষ্ট করে ফেলেছে। শুদ্রের সন্তান পেটে ধরবে না। ও শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বামুন। নষ্ট করে দিয়ে। তোমার সন্তান - পীতাম্বর, তোমার সন্তান সে নষ্ট করে দিয়েছে"। সংবাদটি পাওয়া মাত্রই

টিপ্পনী

পীতাম্বরের স্বপ্নকল্পনার সেই তরুণ যেন যুবক যেন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। আসলে তরুণটি না পীতাম্বর কে নদীগর্ভে পড়ল ? গল্পকারই প্রশ্ন তুলেছেন। অতলে হারিয়ে যাওয়া মানুষটি, কিংবা আত্মপরিচয় হারানোর ভয়ে ভীত মানুষটি এইকদিন রাত্রে তাই বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়ে। মানসিক সমতার অভাবে বিকারগ্রস্থ পীতাম্বর চলে যায় দময়ন্তীর বাড়ির পিছনের বাঁশবাগানে, যেখানে পোঁতা আছে তারই সন্তানের ভ্রুণ। মাটি খুঁড়ে তুলে আনতে চায় সেই একদলা মাংস পিন্ডকে - একবার ছুঁয়ে দেখবে সে, নিজের বংশের উত্তরাধিকারকে। গল্পটির শেষে এই বীভৎসতা অভিঘাতের কাজ করে। সংস্কারগ্রস্থ সমাজের মূলে গিয়ে মর্মরিত হয় পীতাম্বরের ট্র্যাজিক অতিত।

টিপ্পনী

শূন্যবাক্স :

গল্পের পর্যালোচনা :

'শূন্যবাক্স গল্পটি একজন নারীর গল্প। তরাদৈ সেই নারী যে শ্মশানের কাছে একচালা ঝুপড়িতে বাস করে তার দুই শিশুপুত্রকে নিয়ে। এই পৃথিবীতে তার কেই নেই সে আশ্রয়হীনা। তার জীবনের এক স্বপ্ন ভালোবাসার গল্প নিয়ে গড়ে ওঠে এই কাহিনী। একক অপূর্ব সুন্দর কফিন নিয়ে নিজের এক চিলতে চালার মধ্যে সে নিজের ভালোবাসার স্মৃতিকে বহন করতে চায়। হাড়জিরজিরে ছেলেদুটিকে নিয়ে সে নিরুপায় এক মা, নিঃসহায় এক নারী। খড়ির ব্যাপারী হয়নবরের খুব লোভ তার কাঠের বাক্সটির ওপর। শ্মশানের কাঠকারবারী সে; জ্বালানির কাঠ সংগ্রহে গিয়ে সব কিছুকেই স্মশানের আগুনে ভষ্মীভূত করতে পারে সে। তরাদৈ - এর ভয় লাগে তার কাঠের বাক্সটি বোধহয় আর রক্ষা করতে পারবে না সে। শ্মশানের চিতা থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে আনা কাঠের বাক্সটি যে তার অকালমৃত ভালোবাসার প্রতীক। শূণ্য বাক্সটি তাই সে আঁকড়ে থাকে। নিজের প্রেমকে খুঁজে ফেরে শূণ্য বাক্সের মধ্যে।

গল্পের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষনী পাঠ :

প্রায় বারোবছর আগেরএকটি হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের গল্প 'শূণ্য বাক্স'। স্বামী - পুত্র নিয়ে তরাদৈ এর ভাবের সংসার ছিল। অভাব থেকে বাঁচতে লোকের বাড়িতে ঠিকা ঝি'র কাজ করতে লাগল তরাদৈ। বড় সাহেবের বাড়িতে 'ঝি' এর কাজে লেগেছিল সে। বড় সাহেবের বাবার অসুখের সময় তার পুজ - রক্ত পরিষ্কার করা, তার সেবা শুশ্রুষা করা ছিল তরাদৈ - এর কাজ। সুন্দর ফুটফুটে চেহারার বোপাই ছিল বড় সাহেবের ছেলে। ছোট বোপাই খুব ভালবেসেছিল তরাদৈকে। তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। এনিয়ে বোপাই এর বাড়িতে খুব গন্ডোগোল হয়। এমন সময় তার ট্রান্সফার হয়ে যান উজান অসমে। কিন্তু

কিছুদিনের মধ্যেই জিপ গাড়ির সঙ্গে দুর্ঘটনায় প্রান হারায় বোপাই। তার মৃতদেহ কফিনবন্দী করে নিয়ে আসে হয় বিমানবন্দরে। সেসময় যে পুলিশ কনস্টেবল কফিন থেকে রক্তমাখা বরফের কুচি সরিয়ে বোপাই এর দেহকে চিতায় তুলতে সাহায্য করেছিল সে সোমেশ্বর।

গল্পের কাহিনীতে আজ সেই সোমেশ্বর ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার তরাদৈকে শ্মশানের পাশ্ববর্তি তার ঠিকানার টহল দিতে এসে সেই পুরনো কাহিনি শূনিয়েছে। বারো বছর ধরে তরাদৈ রক্ষা করে এসেছে যে ভালবাসার বিশ্বাস তা মুহূর্তে স্খলিত হয়ে পড়েছে সোমেশ্বরের কথায়। সোমেশ্বর তরাদৈকে মনে করিয়ে দিয়েছে আজকের দিন। জেনকিন্স সাহেবদের দিন নয়। সেদিন ছিল যখন কুলি-কামিনদেরও চা বাগানের সাহেবরা বিয়ে করত। কিন্তু তরাদৈ - এর বিশ্বাস, ছোট বোপাই "আমাকে বিবাহ করতে পারল না বলে তি সে বিয়েই করল না এতদিন। বারো বছর কেটে গেছে হয়ত জীবনভরই সে এভাবে কাটাত"। উত্তর শূনে বিরক্ত সোমেশ্বর বলে : ঠাকুরের এই ছেলেটিকে তুই যেমন আহাম্মক ছিলি, এখনও ঠিক তেমনি আছিস। আমি পুলিশের কাজ করি - কান্ডকারখানা শুনে তোকে সব বলতেই এসেছি ....'। আসলে মৃত মানুষের অত সুন্দর কাঠের কফিন ঘরেদের মধ্যে রেখে দেবার রাষ্ট্র হয়ে পড়েছিল। শ্মশানের কাঠ কারবারি, খড়ির ব্যাপারী হয়বরের খুব লোভ ছিল বাক্সটির ওপর। আর তরাদৈ তো একলা তার দুই সন্তান নিয়ে এই ঝুপড়িতে; ড্রাইভার স্বামীর জেল হয়ে গেছে গাড়ি এক্সিডেন্টে মানুষ মারার দায়ে। এমতাবস্থায় তরাদৈ - এর একাকীত্বের একমাত্র সঙ্গী ছিল ওই শূণ্য বাক্সটি যাতে ভর্তি ছিল ভালোবাসার স্মৃতি।

সোমেশ্বর শোনাল অন্য কথা। পকেট থেকে একমুঠো চিঠি বার করে তরাদৈ - এর মুখে ছুঁড়ে মারল। আর বলল -

> "নে এগুলো ওর বিয়ের নেমতন্নের চিঠি। তোর কান্ডকারখানা শুনেই আমি নিয়ে এসেছি। সে তোর জন্য মোটেই বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা করে নি .... বিয়ের তারিখন ঠিক করে চিঠি পর্যন্ত ছাপিয়ে .... দেখ, পড়ে দেখ চিটিটা .... সে সময়ই এ দুর্ঘটনা ... পড় না, পড়ে ওরআত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা কর"।

এরপর সে তরাদৈ এর ছেলেগুলির হাতে কিছু খুচরো পয়সা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে গেল। নির্বাক তরারঐ চিঠিগুলি ছুঁয়ে দেখছিল শ্মশানের ছাই এর মধ্যে যেমনভাবে অস্থি খোঁজে ডোমেরা তেমনভাবে। পরে সে অবাক বিস্ময়ে আবিস্কার করল সত্যিই সেগুলি নিমন্ত্রণপত্র। তারপর তার ওপরেই বসে পড়েছিল যন্ত্রনায়। অনেকদিন সে আর ঘর থেকেই বেরোয় নি ;কেউ তাকে বাইরে দেখে নি। সমস্ত স্বপ্নকল্পনা, ভালোবাসা, বিশ্বাস মিথ্যে হয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পর, একদিন রাত্রে ছেলেদের সাহায্যে শূণ্য বাক্সটি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে আগুণ জ্বালিয়ে দিল সে। সব হারিয়ে যাবার পরও তরাদৈ - যার আজকের পরিচয় একজন বেশ্যা হিসেবে -

তাকে জীবনের নতুন যুদ্ধে আবতীর্ণ হতে হয়। হিজলের ডালে তেমনই বুলবুলিরা লুটোপুটি খাচ্ছে, সকালের সূর্য তেমনই উঠছে - শুধু তরাদৈ - এর সাধের ভালবাসা, বিশ্বাস তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

বারো বছর ধরে নিজের ভালবাসাকে যেমন সে আগলে রেখেছিল তেমনই সেই মিথ্যে ভালবাসার স্মারকটিকে আগুণে জ্বালিয়ে দিতেও বুক কাঁপে নি। নারী হিসেবে এখানে তরাদৈকে অনেক এগিয়ে রেখেছেন লেখিকা।

টিপ্পনী

গল্পে চিত্রিত পরিবেশ :

গল্পটির মধ্যে একটি শ্মশানের নারকীয় পরিবেশের চালচিত্র আছে।মানবিক প্রবৃত্তই সমূহের বিপ্রতীপতা পরিস্ফূট করার জন্য সে পরিবেশ কাজে লাগে। একদিকে তরাদৈ - এর সব হারানো ভালোবাসার প্রতি টান, অন্যদিকে হযবরের কাঠের বাক্সটির প্রতি লোভ - দুটি প্রবৃত্তিই এই শ্মশানের বীভৎসতার প্রেক্ষাপটে অভিঘাতের মত ফুটে উঠেছে গল্পে। তরাদৈ এর ভালোবাসার বিশ্বাস এক পুলিশ কনস্টেবলের দেওয়া সংবাদে মুহূর্তে চুরমার হয়ে যাওয়ার মধ্যে কাজ করেছে তরাদৈ - এর সামাজিকন অবস্থান। শ্মশানে পরিবেশ সংস্থাপনে মানবিক বিশ্বাসহীন, নারকীয়তার এক কৌশল ব্যবহৃত হয়েছ। গল্পের শুরুতে আছে; “শ্মশানে মানুষ পোড়া গল্প তো রয়েছে তায় দূর থেকে ভেসে আসছে কাগজিলেবুরও গন্ধ; দুই মিলে এক অদ্ভুত গন্ধেদর সৃষ্টি হয়েছে”। আবার শ্মশানে পুলিশের টহলদারির কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে-

> “কেবল পুলিশের গাড়িই দেখা যাব; গুলিতে মরা শবের হ্যান্ডওভার সার্টিফিকেট আছে কিনা বা হাসপাতালের সার্টিফিকেট ছাড়াই কেউ জারজ সন্তানের সৎকার করল কিনা এসব খবর নিতেই হয়তো পুলিশের এই আনাগোনা শুরু হয়েছে।”

এসব মিলেই তৈরি হয় অনাকাঙ্খিনত বীভৎসতা যা গল্পের সুচারু বিন্যাসকে শিল্পিত করে তোলে। তরাদৈ এর আন্তরিক ভালবাসা যে কতটা বিপন্ন এই মির্মিত সামাজিকতায়, তা এই শ্মশানেদর প্রতিবেশে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। গল্পের শেষে যকন কাঠের বাক্সটি তরাদৈ আগুনে জ্বালিয়ে দেয়, তখন লেখিকা শ্মশানের পরিবেশের যে বর্ণনা দেন তা আবিস্মরণীয়। এমন চিত্রকল্প শুধু যর্থাথই নয় আধুনিক ভারতীয় আখ্যানে আমরা খুব কম পেয়েছি।মনে পড়বে ‘ছিন্নমস্তার মানুটাই’ উপন্যাসে এমনই এক চিত্রকল্প দিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছিল।

টিপ্পনী

প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনি :

১. ইন্দিরাগোস্বামীর সহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২. ‘শূণ্যবাক্স, গল্পটির মধ্যে একটি অসহায় নারীর করুণ আত্মকাহিনীর কথাই শিল্পিত হয়ে উঠেছে - আলোচনা করো।

৩. ‘সংস্কার’ গল্পে ইন্দিরা গোস্বামী কী সংস্কার ভাঙা বা ভাঙতে না পারার গল্প শুনিয়েছেন লেখো।

৪. দময়ন্তি ও পীতাম্বরের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ভাবে সংস্কার গল্পে শিল্পরূপ লাভ করেছিল আলোচনা করো।

৫. পরশুর কুয়োখননের গল্পে পুরুষকারের যে জয় ঘোষিত হয়েছে তা কতখানি শিল্পসম্মত আলোচনা করো।

৬. বরফের রাণী গল্পো নারী মনস্তত্ত্বের যে প্রকাশ লেখিকা ঘটিয়েচেন তা স্বরূপ স্পষ্ট করো।

৭. বরফের রাণী গল্পচে সীতদেবী মনুষ্যেতর প্রাণীর পচরতি সে সমবেদনা প্রকাশ করেছেন গল্পটির রচনার পটভূমির সঙ্গে তার গুরুত্ব কোথায়?

৮. যাত্রা গল্পের যাত্রাপথটির বর্ণনা দিন।

৯. অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের রাষ্ট্রের বঞ্চনা কীভাবে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে সেকথা কী যাত্রা গল্পে সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন লেখিকা? - আলোচনা করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. আমার পিতৃ - পিতামহ যে পুরুষসিংহ ছিলেন তুমি তো তা জানো - কে কাকে কথাটি বলেছিল। কথাটির তাৎপর্য কী?

২. সদময়ন্তীর সঙ্গে মিলিত হবার পরের তিনমাস পীতাম্বর কী স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল?

৩. ‘ও নষ্ট করে ফেলেছে’ - কে বলছে? কেন এবং কী নষ্ট করে ফেলেছে? এর মধ্যে তার কী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

৪. “সে যেভাবে ঝড়ের বেগে এসেছিল ঠিক তেমনই ঝড়ের মতোই অন্ধকারের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। - কে অর্দশ্য হয়ে গেল? সে এতক্ষণ কী করছিল।

৬. ঈশ্বরীর পারিবারিক পরিচয় দাও ।

৭. রাস্তার গোরুটিকে বরফের রানি’ বলে মনে হয়েছিল কার এবং কেন?

৮. উর্মিলা ভট্টাচার্যের পেশাগত পরিচয় দাও। তার অন্য সঙ্গীদের সম্পর্কে লেখ।

৯. ঝুপড়ির ওই নষ্ট মেয়েমানুষের সঙ্গে তোমার তফাৎ কী? - কে কাকে কেন বলেছিল?

টিপ্পনী

NOTES

NOTES

NOTES